একাদশ অধ্যায়

লৌকিক দেবতা ও তাহাদের বিশিষ্ট পূজাবিধি ।

উত্তরবঙ্গের লোকায়ত জীবনে বিশেষভাবে রাজবংশী সমাজের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক দেবদেবী নিয়ে একাধিক গবেষক পন্ডিত নানাভাবে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে যার নাম করা যেতে পারে তিনি ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় । তিনি এ ব্যাপারে RAJBANSIS OF NORTH-BENGAL গ্রন্থে বিভিন্ন লোকদেবদেবীর বিষয়ে শুধু সুবিস্তৃত আলোচনাই করেন নি তার সাথে প্রমাণপঞ্জী স্বরূপ নানা দেবদেবীর চিত্র ও (ছবি) উপস্থাপিত করেছেন । বিশেষভাবে বিষহরি বা মনসার চিত্রের কথা বলা যেতে পারে । এরপর উল্লেখযোগ্য কাজ যিনি এ বিষয়ে করেছেন তিনি ডঃ গিরিজা শংকর রায় । তার গবেষণা গ্রন্থ —'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেব দেবী ও পূজা – পার্বণ' -এর কথা সহজেই মনে আসে । এই গ্রন্থে তিনি ও বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী যথা — শিব, মহাকাল, মদনকাম, মহারাজ, মধা, সন্ন্যাসী, বুড়াঠাকুর, সোনারায়, ভান্ডানী, আমাতি, বিষহরি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনায় যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন । উত্তরবঙ্গের এই দুই গবেষক ব্যতিরেকে আমাদের গোয়ালপাড়া জেলার ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ও এবিষয়ে তার গবেষণা গ্রন্থে নানাভাবে আলোকপাত করেছেন । এর বাইরেও অনেকে আছেন যারা এ বিষয়ে নানা পত্রপত্রিকায় নানাভাবে আলোচনা করেছেন ।

লৌকিক দেবতা ও তাঁহাদের বিশিষ্ট পূজাবিধি সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনার আরও হয়তো যথেষ্ট প্রয়াস আছে কিন্তু আমার গবেষণা প্রকল্পের নানা অধ্যায়ে লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বর্তমান বিষয়ের প্রতি আলোচনার সুযোগ সীমিত থাকা সত্ত্বেও যে দুটি বিষয়ে কম আলোচনা হয়েছে কিংবা যে দুটি বিষয়ে একেবারেই আলোকপাত কেউ করেন নি সে বিষয়গুলির প্রতি আলোচনায় যত্নবান হয়েছি । একেবারেই সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়নি যেদুটি দেবদেবীর প্রতি তারা হোল কোচবিহার সহরের বড়দেবী ও কাতি পূজা । দেবী অর্থে এখানে দুর্গা । দুর্গা কখনো লৌকিক দেবী নয় কিন্তু কোচবিহার সহরের বড়দেবী পূজার প্রচলন কোচরাজ্য প্রতিষ্ঠার সুচনা পর্ব থেকেই চলে আসছে বলে ইতিহাসবেত্তা পন্ডিতবর্গের ধারণা । তবে এই দেবী বাড়ীতেই যে দেবীর পূজো মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজ্যারম্ভ কাল থেকেই চলে আসছে তা নয় । এই দেবী মূর্ত্তি নির্মাণের যেহেতু বাংলার প্রচলিত দুর্গা প্রতিমার সাথে একেবারেই সম্পর্কশূন্য এবং পূজোয় প্রচলিত রীতির সঙ্গেও যেমন বাংলার দুর্গা পূজার কোন সঙ্গতি নেই তাই এই দেবীকে আমি লৌকিক দেবীর

পর্য্যায়ে আলোচনা করেছি । আমার আলোচনার আর একটি লৌকিক দেবতা 'কাতি' । কাতি অর্থে কার্ত্তিকেয় । কিন্তু উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলায় এই কার্ত্তিককে কেন্দ্র করে যে লৌকিক কথা - কাহিনী ও অনুপম লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে তা বিশেষভাবে লোক সমাজের আশা আকাংখা ও ধ্যান ধারণারই প্রতিফলন স্বরূপ চিহ্নিত হয়ে আসছে এ কারণেই আমি উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলাতে প্রচলিত কাতিপূজাকে লৌকিক দেবতা হিসাবেই আলোচনা করছি ।

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত কাতি পূজা

পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের কলকাতার কেন্দ্রীয় সভায় আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নির্দেশানুযায়ী ১৯৬৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী উত্তর বঙ্গের সংস্কৃতির উপরে লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদে (কোলকাতা - ৩২) একটি বক্তৃতা দিই । সেই বক্তৃতার অংশবিশেষ সম্প্রতিতে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু 'কাতিপূজার' গান ও নাচ' নামক যে অধ্যায়টি রয়েছে তখন তার বিস্তারিত আলোচনা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি । আমি এই পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট যে 'কাতিপূজা' বিষয়ক গানের উল্লেখ পরিশিষ্টাংশে করেছি তা কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমায় প্রচলিত । অনুরূপ গানগান 'বৈরাতী' বা কথাতাবুড়ীরাই গেয়ে থাকেন । এই জাতীয় গানের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী সদর মহকুমার যে অঞ্চলকে স্থানীয় ভাষায় 'ঘুল্লা' বলা হয় অর্থাৎ গঙ্গাধর নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী বিস্তীর্ন অঞ্চল এবং গঙ্গাধর নদীর পূর্বতীরবর্ত্তী অঞ্চলের রাজবংশী ক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে এই পূজার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে । ভাষার ক্ষেত্রেও কোচবিহার ও ধুবড়ী মহকুমার এই গানের ভাষা যদিও হুবহু এক অর্থাৎ কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষায় রচিত তথাপি গানের পদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয় । কাতি পূজায় নাচ-এর জন্য যে গানগুলি ব্যবহৃত হয় তার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে ধুবড়ী মহকুমার গৌরীপুর অঞ্চলের মধ্যে । এর প্রধান কারণ স্থানীয় রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা । এই বড়ুয়া রাজপরিবারের রাজবাড়ীতে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিন পুরুষানুক্রমে আজ অবধি এই পূজার সাথে সাথে নাচেরও প্রচলন রয়েছে ।

এই পূজা প্রধানতঃ রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের নারীরাই করে থাকেন । বিশেষতঃ বয়স্কানারীরা । এছাড়া কুমারীগণও এই পূজায় নাচে অংশগ্রহণ করে থাকেন । কিন্তু গৌরীপুর রাজপরিবার মৌখিলা কায়স্থ সমাজভুক্ত । এরাও এই পূজা করে থাকেন । তাছাড়া কামরূপ জেলা সংলগ্ন গোয়ালপাড়া মহকুমার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কৈবর্ত্ত সমাজের নারীরাও এই

পূজায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। যদিও তাদের পূজার কথা অর্থাৎ গান-গান এবং নাচের গানগুলির মধ্যে অসমীয়া ভাষার কামরূপ জেলার কথ্য ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে পড়তে দেখা যায়।

স্কন্দপুরানে এই দেবতার ব্রতকথার উল্লেখ আছে। হিন্দু রমনী মাত্রেই এই দেবতার পূজা ও ব্রতপালনের অধিকারিনী। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে এই দেবতার পূজা ও কথা শ্রবণ করবার রীতি আছে। অসমর্থ হলে একবারেই পূজা হয়ে থাকে। সায়ংকালে কৃত নিত্যক্রিয়া যজমান আচমনাদি করে গণেশাদি দেবতাগণকে গন্ধ পুষ্প দিয়ে পুন্যাহ বাচন, স্বস্তি বাচনাদি করে সংকল্প করতে হয়। পুরোহিত সংকল্প সূক্তাদির পাঠ করবেন। সাধারণত কামরূপী ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই এই পূজা করে থাকেন। অতঃপর যজমান পূজককে বরণ করে নেবে। তারপর অষ্টদল পদ্মের উপরে পঞ্চশস্য ছড়িয়ে দিয়ে তার উপরে বেদোক্ত ঘট স্থাপন করে মূর্ত্তির চারদিকে চারটি তীর পুঁতে মন্ত্র পাঠ করবে "ওঁ কান্ডাৎ কান্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষসপরি। এবানো দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ।"

তারপর সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতাপসারণ করে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল প্রভৃতির পূজা করে গায়ত্রী পাঠান্তে কাজল দিয়ে কার্ত্তিকেয়ের এবং ময়ূরের চক্ষু দান করে 'ওঁ আং হ্রীং ক্রোং' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলে পরে পূজা করে জপ সমাপন করে প্রণাম করতে হয়। এরপর ত্রিশূল, লৌহখড়্গ, সর্প, অগ্নি প্রভৃতির পূজা করে প্রণাম করতে হয়। এরপর ফল, মূল, নাড়ু, পিঠা, খেলনা দ্রব্যাদি এবং তৈজসাধার ভোজ্যাদি কার্ত্তিকেয় সম্প্রদানক মন্ত্রে উৎসর্গ করে আরাত্রিক করণীয়। চার বছর ব্রত প্রতিষ্ঠার সময়েই হোম করবার বিধান আছে।[২]

কার্ত্তিক ঠাকুরের মূর্ত্তি সোনা, রূপা, তামা বা মাটীরও হতে পারে :——

"তস্মিন্নষ্টদলে পদ্মে সৌবর্ণ প্রতিমাং তথা।
রৌপ্যাং তাম্রময়ীং বাপি মৃন্ময়ীং বা প্রযত্নতঃ।"

ধুবড়ী মহকুমার মালাকারেরা সোনার প্রতিমা নির্মাণ করে থাকেন। কোচবিহার জেলায় সোনার প্রতিমা মূর্ত্তির প্রচলন কম দেখা যায়। সেখানে পূজা হয় ঘট স্থাপন করে। গৃহস্থের বাড়ীতে হলে খোলানবাড়ী অর্থাৎ আগ দুয়ারে পূজা হয়। এতে লাগে কলার থাড়ি, মোলা মুড়ি, ফল-মূল, পঞ্চদ্রব্য এবং সিঁদুর চন্দন। পূজা মন্ডপের চারদিকে থাকে চারটি চারা কলাগাছ - তার মধ্যিখানে ময়ূরবাহন কার্ত্তিকের মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। মন্ডপের মধ্যে

মূর্তি থাকলেও ঘটও থাকে । চারদিকের চারা কলাগাছের মাথায় ধানের শীষ বেঁধে দেওয়া হয় । আবার চারটে কলার গাছেই বাঁশের তীর ও ধনুক রাখা হয় ।

পূর্বেই বলেছি নিঃসন্তান বা কুমারী মেয়েরাই এই কাতি ঠাকুরের পূজা করেন । এদের কাতিপূজা বিষয়ক গানেই আছে : ——

সোয়ামিক না করে রাও ।
ঘর সোন্দেয়া কয়, কাতি বাড়ী যাওঁ ।
বড় দিদি উঠিয়া কয় ছোট দিদিহে বাই,
আশিন কাতি দিন গরিল কাতিবাড়ী যাই ।
বিয়াও হয়া বন্ধ্যানারীর কোলাত নাই ছাও,
কাতিরটে বর মাগিয়া নিমু, মনোও দিমু ভাও ।
সউগ দেবতায় পূজা খায়া যায় চলিয়া ঘর,
কাতি ঠাকুরের পূজা দিলে পাইম পুত্র বর ।

এই দেবতার পূজার অনুষ্ঠান সুরু হয় সন্ধ্যাবেলা ; প্রভাতে হয় বিসর্জন । ঢাকি ঢাক বাজায় । মেয়েরা গায় ও নাচে । স্কন্দপুরাণে রয়েছে, "সায়ংকালে সমারোপ্য প্রাতঃকালে বিসর্জয়েৎ । বাদ্যঞ্চ বিবিধং কৃত্বা কার্তিকেয়ং প্রপূজয়েৎ । গীত নৃত্যোপহারৈশ্চ তস্মিন্ কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ ।" এবং কার্তিকের ধ্যানমন্ত্র আছে : ——

"কার্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্ ।
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্ ॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালংকার বিভূষিতম্ ।
প্রসন্ন বদনং দেবং সর্বসেনাপ মা বৃতম্ ॥"[৩]

কাতি ঠাকুরের কাছে মানত করে সন্তানের জন্ম হলে কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে অবশ্যই এর পুজা করতে হয় আর হাউসে (খুশীমত) এর পূজা করতে চাইলে অগ্রহায়ণ, পৌষ বা মাঘ মাস পর্যন্ত এই দেবতার পূজা করা চলে । পুত্রসন্তান কামনায় অনেক বন্ধ্যা নারী জোড়কাতি অর্থাৎ একজোড়া কাতিঠাকুর পূজা দেবার জন্য 'মানাচিনা' (মানত) করেন । আবার সাধারণ শরীর অবস্থার ক্ষেত্রে অবস্থা বিশেষে সর্বত্র ঘটেও এই পূজা করা হয়ে থাকে ।

শাস্ত্রীয় আচারে পুজার কাজ করেন কামরূপী পুরোহিত ব্রাহ্মণ । পূজা আরম্ভ হয় মেয়েদের হাঁটু গেড়ে বসে কতগুলি বিশেষ ধরনের মুদ্রার সাথে সাথে পুজার ঘট বসানো, পূজাপাতা সাজোয়া গার, চাইলন বসানো, পুরোহিত ব্রাহ্মণকে বরণ করা , শিলানী অর্থাৎ

যারা পূজার শেষে রঙ্গরসের গান গাইতে ও নাচতে এসেছেন এবং ঢাকুয়ার (ঢাকী) প্রভৃতিকে বরণ করে নেবার জন্য প্রার্থনা সংগীত। ঢাকী চলে ঢাক বাজিয়ে হাতের মুদ্রার ভঙ্গী ও গানের সুরেরসংগেতাল মিলিয়ে। পূজার জন্য নির্দিষ্ট এই আনুষ্ঠানিক গানগুলি করে থাকেন এক বা একাধিক 'কথাতীবুড়ী' বা 'বৈরাতী'। পূজার জন্য আনুষ্ঠানিক গানগুলির শেষে সারা রাত ধরে চলে 'নাচনী' মেয়েদের রঙ্গরসের গীত। এই গীতগুলিকে অর্থাৎ যে কার্তিক পূজার পাতোআদি রসাত্মক কথা অধিক পরিমানে থাকে তাকে 'কাতি মামা' গীত বলা হয়।

যে পূজা মন্ডপের মাটিতে কাতি ঠাকুরের পূজা হবে সেই বসুমতী মাকে বন্দনা দিয়ে সুরু হয় এই কাতি পূজার :——

'বসুমতী মাও
একটুক মাটি দ্যাও
এ ঘট বসেবার চাওরে' এইভাবে ক্রমানুয়ে বসুমতী

মাও এর কাছে একটুকু মাটি চেয়ে প্রার্থনা — পূজা পাতবার জন্য, 'মাড়োয়া গাড়িবার' জন্য 'চাইনোন বসেবার জন্য, বামোন অর্থাৎ পুরোহিতকে, গীদালি (গায়িকাদের) এবং ঢাকুয়ারকে (ঢাকীকে) বরণ করে নেবার জন্য।

মাড়ুয়ার ঘরের আগদুয়ার প্যাও (ঢালু)
আইসুচে চাউইয়া মানসি পীড়া ভাড়া দ্যাও।
সোনার ধরম পাওত দিয়া ব্যান বা গচি রুনু
ব্যান তোক কিসের বাদে রুনু
একজোড়া ব্যানপাত হইলে কালে মোর কাতি পূজা হয়।

একইভাবে সে গুয়া গাছ এবং ফুলের গাছ রোপণ করেছিল কিন্তু একজোড়া করে গুয়া এবং ফুল হলেই তো কাতিপূজার অনুষ্ঠানের কাজ হয়ে যায়।

এরপর 'বন্দনাগীতি' অংশে বিভিন্ন দিকের পৌরাণিক গুরুত্ব বর্ণনা করে মূল গানের পালা আরম্ভ করা হয়। পালায় শিবচন্ডীর বিয়ের গানে আছে ——

শ্বেতের চওোরে (শ্বেত চামর) শিবোক বরণ করিয়া নিল।
শুভক্ষণ দেখিয়া শিব বিয়াতে বসিল ॥
ঝড়ি পড়ে (বৃষ্টি পড়ে) টুপুরটাপার গাতে ভেজে গাও।
শিব চন্ডীর বিয়াও হয় ঢাকুকে যোগার দেও ॥

বিয়ের পর —— 'পান তামাকুর খায়া চন্ডীমাও রং তামাসা করে
রং তামাসা কইরতে শিবের বীর্য্য ঢলি পড়ে।'

ফলশ্রুতিতে —   'পাচা রাতি চণ্ডী যাও কাতিক জন্ম দিল ।
কাতিক জন্ম দিয়া মায়ের খুশী উপজিল ॥

এরপর কাতির রূপ বর্ণনা করে নানা প্রকার রসিকতাপূর্ণ গানের পর পুজো যখন শেষ হয়ে যায় তখন হয় 'ঘট তোলার গান' ।

মারেয়ার মাইয়াক (গৃহকর্ত্রীর স্ত্রীকে) দেও বর
মারেয়ানী আমার যাউক ঘর ।
আমার পুজাত করিস ভর
মারেয়ানীক দেও পুত্রবর ।
আপনুয়াতি সোহাগিনী ।
পুত্রের বর পাইল মাড়েয়ানী ॥
ভাঙা নাতোল বুঢ়া কাল ।
মারেয়ানীর সুভাগ কপাল ॥

কাতি ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পুজার পর্ব শেষ হয়ে গেলে সারারাত ঢাকুয়ারের বাজনার তালে তালে গিদালী মেয়েরা নেচে ও গেয়ে চলে । এই পর্বের প্রাথমিক গান সুরু হয় বীর রসাত্মক নৃত্য সহযোগে । তীর ও ধনু থাকবে নাচিয়ে মেয়েদের হাতে । কোনো এক অদৃশ্য শত্রুকে তীর দিয়ে হানতে উদ্যত এমন ভঙ্গীতে মেয়েরা চেনে চলে গানের তালে তালে । এই জাতীয় গানকে বলা হয় বাদুনী হানা গান :——

দূর হাতে আইলরে বাদুর কলা খাবার আশে
আরে গচের কলা গচোত রইলো
বাদুর গেইল মোর দেশেরে ।
আরে তীর পড়ে ঝকেরে ঝকে বাদুর পড়ে রয়া
কুতি গেইল মোর মারেয়ার মাইয়া
বাদুর কুরাও আসিয়ারে ।
গচের আরে থাকিয়ারে বাদুর
কমোরের গাড়ী যাচেরে
দূর হাতে আইলোরে বাদুর
কলা খাবার আশে ।

এইভাবে কাতিপুজার নাচ ও গান রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত চলে । সারারাত ঢাকুয়ার ঢাক বাজিয়ে হয়ে পরে পরিশ্রান্ত । নাচিয়ে নাচনী মেয়েদের দেহবল্লরী ক্লান্তিতে হয়ে আসে অবসন্ন । এ সময় কথাতো মহিলাদের কথাও শেষ হয়ে যায় । দর্শক - শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখ ঘুমে হয়ে

আসে ঢুল্ ঢুল্ । পাখ পাখালীর ডাকে পূবের আকাশে দেখা যায় অরুণোদয়ের আভাস । এমনিতরো পটভূমিকায় ঢাকী বিসর্জনের বাজনা আরম্ভ করার সাথে সাথে বৈরাতী মেয়েদের 'জই মোকারে' ধ্বনিধ্বনি আরম্ভ হয়ে যায় ।

কথাতীমহিলারা ক্লান্ত অবসন্ন চিত্তে 'কাতির বনবাস' পর্বের সমাপ্তি সঙ্গীত সুর করে :———

যাদুর টাকার কাতি যায় বনবাসে ।
উঠো উঠো মারেয়া (গৃহকর্ত্রী) কত ঘুমে থাকো ॥
উঠো উঠো মারেয়া নেও কাতির বর ।
এক শ টাকার কাতি যায় বনবাস ॥
উঠো উঠো মারেয়া নে ও গাভীর বর ।
উঠো উঠো মারেয়া নে ও ধনের বর ॥
ষোল্লো আনার কাতিরে যায় বনবাস ।
উঠো উঠো মারেয়া নেও পুত বর । [৪]

কৈবর্ত সমাজে প্রচলিত কার্তি পূজা

পূর্ব-উত্তর গোয়ালপাড়া অর্থাৎ অভয়াপুরী ও তৎ সংলগ্ন অঞ্চলে এই কার্তিক পূজা কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। পুরুষের এই পূজা করার কোন অধিকার নেই। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা ও গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমাতে আমরা দেখেছি 'কার্তি পূজা' অর্থে শিব - পার্বতীর বিয়ে ও কার্তিকের জন্মই প্রাধান্য পেয়েছে এবং তা মুখ্যতঃ সেই অঞ্চলের রাজবংশী ক্ষত্রিয়া, কায়স্থ ও নমশূদ্রদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে কিন্তু অভয়াপুরী সংলগ্ন অঞ্চলের কৈবর্ত সমাজের কার্তি পূজার বৈশিষ্টই হচ্ছে কার্তিকের বিবাহোৎসব। এঁদের বিশ্বাস কার্তিক অবিবাহিত। সেজন্য কার্তিকের বিয়ে উপলক্ষ্যে সমস্ত কিছুর আয়োজন করে পূজার কাজ আরম্ভ করা হয়। এই পূজায় নিঃসন্তান মহিলা বা বিবাহেচ্ছুক কুমারী মেয়েরা উপবাসে থেকে ব্রতপালন করে ভবিষ্যৎ সন্তান কামনার জন্য, সেজন্য এ অঞ্চলে কার্তি পূজায় আর এক নাম 'বরত পূজা' বলে জানা যায়।

প্রাগুক্ত অঞ্চলের কার্তিক পূজায় পুরাণের সব কথাই মেলে শুধু দেবসেনা নামে তরুনীর পরিবর্তে আর একজনের নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন উমাবনী। কিন্তু উমাবনীকে বিয়ে করতে গিয়েও বিয়ে হোল না যে কারণে তারই কাহিনী রয়েছে এঁদের মধ্যে প্রচলিত।

কার্তিক বরের সাজ পোষাক পরে উমাবনীকে বিয়ে করতে চলছেন। মা কার্তিককে পিছন ফিরে চাইতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে কার্তিক পিছন ফিরে দেখে যে তাদের বাড়ী থেকে কুন্ডলী পাকিয়ে ধোয়া উঠছে। অজানিত বিপদাশংকায় কার্তিক বাড়ী ফিরে এসে দেখলেন পার্বতী দর্জায় খিলদিয়ে রাক্ষসী মূর্তি ধরে বহুবিধ ব্যঞ্জনে খেতে বসেছেন। মাকে ডাক দেয়ায় পার্বতী ঘর থেকে সাজ-পোষাক পড়ে বেরিয়ে এলেন। কার্তিক অবাক বিস্ময়ে তার এই রাক্ষসী মূর্তি ধরে গোগ্রাসে খাদ্য গ্রহনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় পার্বতী উত্তর দিলেন যে নোতুন বউকে ঘরে নিয়ে এসে এরকম স্বাধীনভাবে আর সে কোনদিন খেতে পারবে না সেজন্য আগে ভাগেই ভালো করে খেয়ে নিচ্ছে। নোতুন বউকে ঘরে আনলে যদি থাকেই স্বাধীনতা হারাতে হয় তবে সে বিয়ে না করাই ভালো। কার্তিক বিয়া না করাও বলে প্রতিজ্ঞা করায় তিনি অবিবাহিতই থেকে গেলেন। এই লোক বিশ্বাসের কাহিনী হচ্ছে প্রাগুক্ত অঞ্চলের কৈবর্তসমাজের মধ্যে লোক বিশ্বাস (FOLK BELIEF).

এঁদের মধ্যে অন্য যে কাহিনীটি আছে এবারে তার উল্লেখ করছি :—— কার্তিকের রূপে মোহিত হয়ে পার্বতী তাকে একান্ত নিজের করে পেতে কামনা জানান । কারণ কার্তিক তো তার পার্বতীর গর্ভধারণ করা সন্তান নয় । সৌন্দর্যের প্রতীক কার্তিক । সে পার্বতীকে একবার মাতৃ সম্বোধন যখন করেছে তখন তার এই কামনার প্রস্তাবকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারল না । আকাশ থেকে পড়ার মত হোল তার অবস্থা কার্তিক তখন তার বাহন ময়ূরের সাথে পরামর্শে বসল । আলোচনায় সাব্যস্ত হোল কার্তিক (মা) পার্বতীর প্রস্তাবে সম্মতি জানাবে একটি সর্তে । তা হোল :— এমন একটি নির্জন স্থান খুঁজে বার করলেন । এবং পূর্ব সর্তানুযায়ী পার্বতী যেই মিলনাকাংখায় কার্তিকের সমীপবর্তী হলেনতখনি বাহন ময়ূরের তারস্বরে কেকারধ্বনি চারদিক মুখরিত করে তুলল । সুতরাং পূর্ব – প্রতিশ্রুতি লংঘিত হওয়ায় পার্বতীকে নিরাশ হতে হোল । নিরাশ হয়ে পার্বতী ময়ূরকে অভিসম্পাত দিলেন যে তাকেও এই ভাবে মিলনের ক্ষেত্রে নিরাশই হতে হবে ।

এঁদের মধ্যে কার্তিক কিংবা অঘ্রানের সংক্রান্তির দিন এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় । একটি বিবাহের অনুষ্ঠানে যা প্রয়োজন হয় তারই যোগার করা হয় । কেননা আগেই বলা হয়েছে কার্তিক পূজার অনুষ্ঠানের অর্থে কার্তিকের বিবাহোৎসবেরই অনুষ্ঠান । এতদাঞ্চলের বিবাহের রীতি অনুযায়ী 'সুয়াগুড়ি তোলা', 'পানি তোলা' প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হয় । একজন বর্ষীয়সী মহিলা কথাতো এই পূজার পরিচালনা করেন । তিনি বলেন :——"বরতী পিনান বরত করবা আইছ । এই যে চায় চেঙরা আইসে খাব কি ? (এ সময় কিছু অশ্লীল কথাও বলা হয়ে থাকে) মুগুর গজি হাজির করি দি । চর চরনী সুখনা মাছের ভাত বরোনি ।' (এসময়ে প্রনাম করে নানা দেবতা ও অপদেবতার নামে ধ্বনি দেওয়া হয়) এই সমস্ত নানা দেবদেবী ও নানা ধরনের উপদেবতা ও উপদেবীর নাম :—— ধরম করম, মহাদেব পার্বতী, বলদ গণেশ, কাতি-পাতি, লক্ষ্মী - সরস্বতী, ভগবতী, শ্মশান কালী, রুদ্রাকালী, মহামায়া, কাচাই খাইতী, শীতলী, বারমায়া, বারদেবতা, বারবইনী, সাত বইনী, ধরা - চেলা , ডাং ধরা, ডাইনী, যখিনী, হান্তরী, মুড়ুরী এই বলে হরিধ্বনি শেষ হয় ।

এবারে আরম্ভ হবে গান :——

আমার বাইরং কাল মনা
রাতি আহিবি দিনত মানা ।
বাইরং গেইছে গুয়াহাটি
ভাল চাইয়া আনিবে গাভিরে
বাইরং পাগল করিলি ।

পাগল করিলি ভাল করিলি
বুড়া তিরীর বধ নলি রে বাইরু
(বন্দু) পাগল করিলি ।

(এই গানের অংশটি প্রতিটি অধ্যায়ে অনেকটা ধুয়া বা ধ্রুব পদের মত গাওয়া হয়ে থাকে)

সুয়াগ তোলা গীত ॥

কাচি জোনাকত তুই মোর সাথী
কাঁহা নিয়া ভায়ারে তোর নাওত কি কি যায় ?
মোর নাওত কি কি যাব ?
বরত করা ঘট বাতি (ছাতি ?) যায়
সেই ঘটরে কি বরে পায় ?
পুত্র হেনা ধন পায় ।
চালা ঝিকা নুনর বালি
কুন কুন থোনি বোলে শাহুর গালি ।
মইতে খুজছিন বরত করবা,
গহে নেদনা বরত করবা ।
সেই অপমানে আইথেক গেলু
বাড়ী ভরিয়া কঁহারি (কুসিয়ার) বুনু ।

এইভাবে কলা, ফুল পাতা ইত্যাদি বিষয়েও বর্ণনা দিয়ে গান গাওয়া হয় ।

পূজার ঘট বসানোর গীত ॥

আট আঙুল মাটি বসুমতী আই,
ঘট বহালু চায়ে চায়ে,
(মই) পাত কাটিনু থায়ে থায়ে ।
ঘট বহালি কি বর পায় ?
স্বামী হেনা ধন পায়
পুত্র হেনা ধন পায় ।

(এইখানে পুনরায় আগের সেই ধ্বনিটি —'ধরম করম হান্ডরী, মুডুরী, আই' বৈরাতীরা দিতে থাকবে ।)

ঝাপনা গাতার গীত

বেলপাতে ছাইলাম ঘর নওলায় বাতি
কুনে কুনে বান্ধিলা কাতিকর ঘর খানিরে

(এইভাবে বেলের পাতা, ময়নার পাতা, কলার পাতা, কুসিয়ারের পাতা, নানা বিধ ফুল এর বর্ণনা করা হয় । এর সাথে অবশ্য পূজার অন্যবিধ সামগ্রীর গীতও আছে)

কলা কলা কাতিগন শিব শিব করে কি রাজাহে ।
এইতে না কি দেখলু কলা কাতিগন যাইতে কি রাজাহে ।
বেল তলে থাকিয়া বেল ফল খাইতে কি রাজাহে ।

(এইভাবে ময়না , কলাই, কলাপাতা, ধূপ -পূনা, নারিকেল প্রভৃতি পূজা উপচারের বর্ণনা দিয়ে গান গাওয়া হয় ।)

কার্ত্তিকের বিগ্রহ স্থাপনের পর তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা :——

ছাওয়াল কাতিকা আইছে
ঘর বাছি লৈয়া,
কার্ত্তিক ঠাকুরের মুর বানাইলা
আনি বসিয়া ,
সিও মুর নহল কাতিক ঠাকুরের যোগ্য, রে রাজা ।

(এইভাবে অন্য অন্য অঙ্গ কার্ত্তিক ঠাকুরের উপযুক্ত নয় বলে বিবেচিত হওয়ায় আক্ষেপ করে গান গাওয়া হয় ।)

বিভিন্ন দেবতার বন্দনা :——

আজি কি কি কিসের জোগার পরে,
নাজানু ধরম করম কুনদিকে সাজে ।
আজি কি কি কিসের জোগার পরে
নাজানু মহাদেব পার্বতী কুন দিকি সাজে ।

(এইভাবে বলদ, গণেশ, লক্ষ্মী সরস্বতী, ভগবতী প্রমুখ দেব দেবী গণের বর্ণনা করা হয়ে থাকে)

কুরেয়া রাজার গীত । অর্থাৎ কুষ্ঠরোগে হাত পা খসে হওয়া রাজার গীত ।

কার্ত্তিক মাসেরে কি বরত করেরে, আচাগে,
আচাগে কুরেয়ারে, ময়না ডাক পরে ।

কার্তিক মাসেরে কি বাঘের ভয়রে, আচাপে,
সেই বাঘ মারিবে , তার ছাল করিবে ,
কুরেয়ারে, মইনা ডাক পরে ।

এই গানের পরে কথাকী বৈরাতী কুরেয়া রাজার কাহিনী বর্ণনা করে শোনাবে : — গঙ্গার পারে এক দুস্থ ব্রাহ্মনের দুটি শিশু কন্যা ছিল । পুরোহিত ব্রাহ্মণের অভাবে এর অন্ত নেই । ভিক্ষার অন্নে ব্রাহ্মণী এবং শিশু কন্যা সহ ব্রাহ্মণের কোনোদিনই পেট ভরে খেতে পায় না । একদিন ব্রাহ্মণের পেট ভরে ভাত খাওয়ার ইচ্ছে হোল । তিনি তার স্ত্রীকে বললেন আজআর ঘুম থেকে ডেকে তুলে মেয়েদের ভাত খাওয়ানোর দরকার নেই । কিন্তু হাজার হলেও মায়ের মন ; তিনি ছোট দুটি মেয়েকে অভুক্ত রেখে নিজে মা হয়ে কী ভাবে ভাত খেতে পারেন ; তাই ব্রাহ্মণী বুদ্ধি করে একমেয়েকে পীড়িতে ও আর এক মেয়েকে ঘর ঝার দেওয়া 'বানুনী' র ওপর শুইয়ে রাখল । ভাত হওয়ার পর ঘর পরিষ্কার করার প্রয়োজন হওয়ায় বাননী নিতে গিয়ে এক মেয়ের ঘুম ভেঙে গেল এবং বসার জন্য পীড়ি তুলতে গিয়ে আর এক মেয়েরও ঘুম ভেঙে গেল বলাই বাহুল্য দরিদ্র মেয়ে দুটিকে তাদের মামাবাড়ীতে রেখে আসার অছিলায় দূরে এক তেপান্তরের মাঠে ছেড়ে দিয়ে এল । সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসে দুবোনে বাবাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে পরিশ্রান্ত হয়ে সেই মাঠেই ঘুমিয়ে পড়ল । সকালে দুজনে জেগে উঠে হাটতে হাটতে মনুষ্য বসতিপূর্ণ গ্রাম খুঁজে পেল । ক্ষিধের চোটে তারা এক গৃহস্থের কুসিয়ারের ক্ষেতে ঢুকে পড়ল । কিন্তু ~~ম~~ হা অদৃষ্ট ; তাদের পাশনেই কুসিয়ারের খেত পুরে ছাই হয়ে গেল । এরপর তার গেল এক গৃহস্থের কলা বাগানে । কলাবাগানেরও সেই একই দশা হোল । গ্রামের মানুষ তাদের দুবোনকে অপয়া অলক্ষুনে ভেবে গ্রাম থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল । মনের দুঃখে তারা দুজনে এক নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হোল । সেই নদীতে স্বর্গের তিন অপসরী ~~ক্ষ~~ খার দিয়ে স্নান করছিলেন । অন্যদিনে তাদের গা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত খারের কিছুটা রয়ে যায় কিন্তু সেদিন তাদের খার, স্নান করার আগেই শেষ হয়ে গেল । কেন এমন হোল, এই চিন্তা করার সময় তারা সেই অভাগিনী বোন দুটিকে দেখতে পেলে । তখন তারা সেই দুবোনকে কাছে ডেকে এনে ভালো করে স্নান করে দিয়ে একটি আঙটি তাদের ~~কার্তিক-পূজা~~ দিয়ে বললে যে তারা যেন প্রতি সপ্তাহে 'বরত পূজা' অর্থাৎ কার্তিক পূজা করে । রাজা এবং মন্ত্রীর সাথে দুবোনের বিয়ে হবে বলেও বরদান করলেন । বিয়ের পরে যদি কারো কোনো আপদ বিপদ উপস্থিত হয় তাহলে সেই আঙটি অন্য জনকে পরিয়ে দিলেই বিপদ থেকে উদ্ধার হবে ।

অপ্সরী প্রদত্ত আঙটি ও বর পেয়ে দুবোন যেদিকে যায় সেদিকে জয় জয়কার ।

তারা দুবোনে কার্ত্তিক পূজা করতে থাকল। একদিন দেশের রাজা ও মন্ত্রী মৃগয়া করতে এসে দুবোনকে দেখে ভারী মুগ্ধ হলেন। রাজা এবং মন্ত্রীদুবোনকেই রাজবাড়ী নিয়ে গেলেন এবং বড় বোনকে রাজা ও ছোটবোনকে মন্ত্রী মশাই বিয়ে করলেন। অপ্সরীদের বরদান সার্থক হোল। রাজা ও মন্ত্রীমশাইর আগের স্ত্রীরা ছিলেন, তাদেরও বরত পূজা অর্থাৎ কার্ত্তিক পূজা করার জন্য দুবোন রাজা ও মন্ত্রীকে অনুরোধ উপরোধ করতে লাগল। রাজার আগের রাণী এই বরত পূজার বিরুদ্ধাচারণ করে রাজার কাছে অনেক নালিশ ক্রমাগত জানাতে থাকলে একদিন রাজা বররানীর কথাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে বরতপূজার সামগ্রী নাধি মেরে তেলে দেয়ার ফলে রাজার গায়ে কুষ্ঠ ব্যাধি দেখা দিল। মন্ত্রীর স্ত্রী ছোট বোন বড় বোনের এই বিপদের কথা শুনে সেই অপ্সরী প্রদত্ত আঙটি বড়বোনের কাছে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু শনির প্রকোপে আঙটি পথেই হারিয়ে যায়।

আঙটি হারিয়ে গেলেও দুবোন নিরাশ হল না। তারা দুজনে রাজার কুষ্ঠব্যাধির আরোগ্য কামনা করে বরত পূজা করায় রাজা ব্যাধিমুক্ত হলেন এবং রাজ্যে বরত অর্থাৎ কার্ত্তিক পূজার প্রচলন করলেন।

উপরিউক্ত কাহিনীটি পরিবেশন করার পর এয়োতিরা জোকার দেবে এবং পূর্বে উল্লিখিত'আমার বাইরং কালসনা রাতি আহিবি দিনত যানা' গানটি গাওয়া হবে। গান শেষ হলে পুনরায় কার্ত্তিকের জন্মকথা ও ময়ূরের কেকারব ধ্বনির কথা বলা হয়। এইভাবে রাত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গেই পূজাও শেষ হয়ে যায়। [৫]

হাজং দের মধ্যে প্রচলিত কার্ত্তিক পূজা ॥

কার্তির জন্ম।

একদিন হয়া চন্ডা তিন দিন হয়রে
চন্ডা নাইরে কুতি গেইলরে।
বান্দী দাসী সবে আসতে লাগিল রে।
তেলের বাতি বিলায় আংছা নয়া গাং সিনানে যায়রে।
আগে পাছে বান্দী দাসী মধ্যে যায় চন্ডীরে।
কতেক দূর যায়রে কতেক লাগল পায়রে।
কতেক দূর যায়া চন্ডা যমুনা লাগল পায়রে।
যমুনা ঘাট যায়া চন্ডা নামতে লাগিল রে
এই না খিলা আংছা চন্ডী কেশত বান্দিল রে।

কেহ ঘষে কেশ চণ্ডীর কেহ ঘষে পাওরে ।
চন্দন যেনা গাও চণ্ডীর ঘষিত লাগিল রে ।
পাতা পানীত নামিয়া চণ্ডীর পাতা করিল শুধরে ।

এইভাবে হাটু পানীত, কমর পানীত, বুক পানীত, গলা পানীত, মাথার বর্ণনা দিয়ে গান করা হয় ।)

গলা পানীত নামিয়া চণ্ডী মারে পঞ্চ ডুবরে ।
কেশের ভারে চণ্ডী উঠিবাক না পারিল রে ।
আছে পাছে, বান্দী দাসী তুলিবাক লাগিল রে ।
উপর ঘাটে সিনান করে চণ্ডী নামা ঘাটে উঠেরে ।
এই না পাটের শাড়ী চণ্ডী ~~পি~~ পিন্ধিতে লাগিল রে ।
এই না মাথার কেশ চণ্ডী শুকাইতে লাগিল রে ।
এই না মাথার কেশ চণ্ডী বান্ধিতে লাগিল রে ।
এক মাস হয়্যা চণ্ডী দুই মাস হলরে ।
তিন মাস হয় চণ্ডী জানিল স্বামীরে ।
চারমাস হয়্যা চণ্ডী লোকে প্রচার হলরে
সাতমাস হয়্যা চণ্ডী সাত ফল খায়রে ।
দশমাস দশদিনে চণ্ডীর পায়ে দিল জানারে ।
আসিত লাগিল বান্দী ঠেনা চণ্ডীর কাছেরে ।
গা শাড়ীর গুমানী ধাই — মাও নাই করে রাওরে
সিন্দুর গুমানী ধাইমাও নাই করে রাওরে ।
গুয়া পানের গুমানী ধাইমাও নাই করে রাওরে ।
এক শাড়ীর বাদে ধাইমাও দুই শাড়ী দিমরে ।
এক পোর তেলের বদলি দুই পোর তেল দিমরে
এক গুয়া পান ~~বদলি~~ বদলি দিম দুই গণ্ডারে ।
সব দান পায়্যা ধাই মাও রঙ্গ হইল মনেরে ।
হাটিয়া নরিল ধাইমাও এনা চণ্ডীর কাছেরে ।
ঠেনা তেলের বাটি ধাইমাও ঝরিতে লাগিলরে ।
ভূমিতে পরিল কাতি কান্দে তাহাও তাহাও রে ।
দশ মাস দশদিনে কাতি ভূমিদান পাইলরে ।
আখি মেলে চায়রে ।

ডিরিয়া বসিল ধাইমাও কোলাতে তুলিল রে ।
সাত ডাল সুতা দিয়া ধাইমাও নাড়ি বন্ধন করেরে ।
সোনার তিচকুনি দিয়া ধাইমাও নাড়িছেদন করে রে ।
গঙ্গার ধারে ধাইমাও ধুইয়া তুলিল রে
ব্রহ্মার ঝালে ধাইমাও সেকিয়া তুলিল রে ।
নানা গন্ধের তেল কাতিক মাখিতে লাগিল রে ।
যাইতে লাগিল কাতির বাপ নাপিতের বাড়ীরে ।
হাতে লাঠি কান্দে ছাতি নাপিত আসিতে লাগিল রে ।
বসিতে লাগিল নাপিত কাতির সামুয়ে রে ।
পাঁচ পাচের পাচাকি ছুয়া নাপিত কামাইতে লাগিল রে ।
জোরা গুয়া জোরা পান বিদাকি গোইল রে ।
বিদাকি পায়া নাপিত চলিয়া গেলরে ।
অচির হইল চন্ডীরে ।

কাতির রূপ বর্ণনা

কাতি, কাতি, তোর নাক বানাইসে কিসের কারণে ?
আনুন জনমে শংক মিলাইছে চান্দ গোপাল রে ।
কাতি কাতি তোর চকু বানাইসে কিসের কারণে ?
আনুন জনমে চন্দ্র মিলাইছে চান্দ গোপালরে ।
কাতি কাতি তোর কান বানাইছে কিসের কারণে ?
আনুন জনমে কুলা মিলাইছে চান্দ গোপালরে ।
কাতি কাতি তোর হাত বানাইছে কোন জনে ?
আনুন জনমে গাইন মিলাইছে চান্দ গোপাল রে ।

কাতি পূজায় রং রহস্যের গীত ॥

(অমুক এবং আমুকীর স্থলে একজন ছেলে ও অন্যত্র একজন মেয়ের নাম করা যায় ।)

তুলা হেন বৌর বৌর যৌবন হেনা নদী ,
সউক ফুল ফুটিছে আমুকী পরিছে বন্দীরে ,
আমুকী পরিছে বন্দী ।

অমুক ছেড়া হাল বোয়ায় কালা গরু দিয়া ,
আমুকী ছেড়ী মাছ ধরে আলিকোনা দিয়া ।
অমুক ছেড়া হাল বোয়ায় মাথায় ঝাপি দিয়া ;
আমুকী ছেড়ী চায়া থাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ।
অমুক ছেড়া ধুতী পিন্দে হাসিয়া হাসিয়া ;
আমুকী ছেড়ী গাও কাচায় কমর হেলেয়া ।
অমুক ছেড়ায় পিন্দিব গাও কাচা জুতা ;
আমুকী ছেড়ী পিন্ধিব ছিনকেটের মেখেলা ।
আর এক সাথে চলিয়া যাব , যায় বলব দেশের বন্ধুরে ।

হুদুম দেও পূজা

হুদুমদেও পূজা উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলার প্রায় সর্বত্রই রাজবংশী সমাজের গ্রামীণ মহিলা সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে প্রচন্ড খরা ব্যতীরেকে এ পূজা সাধারণতঃ করা হয় না। এই লোকদেবতা সম্পর্কে এ যাবৎ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অনেকে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ও ডঃ গিরিজা শংকর রায় মহাশয়দ্বয়ের নাম। তবে হুদুমদেও পূজা সম্পর্কে মনে হয় সর্বপ্রথম সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পান ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি এই দেবতা প্রসঙ্গে বলেছেন, " THE WOMAN FOLK OF KĀMATĀPUR USED TO SING AND EVEN NOW A DAYS ARE SINGING AND PRAYING TO GOD HUDUM, BY PERFORMING NAKED DANCES IN A SECRET PLACE IN THE DEAD OF NIGHT, IN ORDER TO BRING RAIN AT THE TIME OF DRAUGHT.[৭]

ডঃ গিরিজা শংকর রায় পূজা অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বলেছেন, "দুইটি ব্যাঙ হুদুমদেও পূজা অনুষ্ঠানে লইয়া যাওয়া হয়। তন্মধ্যে একটি ব্যাঙা অর্থাৎ পুরুষ ব্যাঙ এবং অন্যটিকে ব্যাঙী অর্থাৎ স্ত্রী ব্যাঙ কল্পনা করা হয়। ব্যাঙ দুইটি যাহাতে পালাইতে না পারে তজ্জন্য একটি খুঁটিতে দড়ি দিয়া উহাদিগকে বাঁধিয়া রাখা হয়। হুদুমদেও –এর পূজা শেষ হইলে বাড়ী হইতে লইয়া যাওয়া বালতি বা লোটার জলে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া সরিষার তৈল দেহে মাখিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর একটি পিড়িতে বা আসনে বসাইয়া দুইজনের কপালে সিঁদুর মাখাইয়া দেওয়া হয়। ..... বিবাহ পর্ব সমাপ্তির পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।[৮] এক জন অসমীয়া লেখকের মতে পশ্চিম গোয়ালপাড়া জেলার ব্যাঙ এর বিয়ে ছাড়াও বন থেকে এক ধরণের হুদু পাখী এনেও পূজা করা হয়। "হুদুম পূজাত বনত থকা হুদুম (হুদু) চরাই ধরি আনি পূজা করা হয়।"[৯] কিন্তু পশ্চিম গোয়ালপাড়া জেলায় এধরণের হুদু পাখী (পেচা জাতীয়) হুদুম পূজায় প্রচলনের খবর গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে কোন রাজবংশী সমাজের লোকমুখে শুনতে পাইনি। সুতরাং অসমীয়া লেখকের এই মত এই পূজা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মনে হয় গ্রহণ যোগ্য নয়।

হুদুম দেও পূজা

এই পূজা প্রধানতঃ রাজবংশী ক্ষত্রিয় রমনীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। হুদুম দেও অর্থে দেবরাজ ইন্দ্রকেই বলা হয়ে থাকে। আলোচ্য প্রকল্পভুক্ত রাজবংশী সমাজের মধ্যে এই

হুদুম দেও পূজা

হুদুমদেও পূজা উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলার প্রায় সর্বত্রই রাজবংশী সমাজের প্রাচীণ মহিলা সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে প্রচন্ড খরা ব্যতীরেকে এ পূজা সাধারণতঃ করা হয় না। এই লোকদেবতা সম্পর্কে এ যাবৎ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অনেকে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ও ডঃ গিরিজা শংকর রায় মহাশয়দ্বয়ের নাম। তবে হুদুমদেও পূজা সম্পর্কে মনে হয় সর্বপ্রথম সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পান ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তিনি এই দেবতা প্রসঙ্গে বলেছেন, " THE WOMAN FOLK OF KĀMATĀPUR USED TO SING AND EVEN NOW A DAYS ARE SINGING AND PRAYING TO GOD HUDUM, BY PERFORMING NAKED DANCES IN A SECRET PLACE IN THE DEAD OF NIGHT, IN ORDER TO BRING RAIN ATTHE TIME OF DRAUGHT.[৭]

ডঃ গিরিজা শংকর রায় পূজা অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বলেছেন, "দুইটি ব্যাঙ হুদুমদেও পূজা অনুষ্ঠানে লইয়া যাওয়া হয়। তন্মধ্যে একটি ব্যাঙ্গা অর্থাৎ পুরুষ ব্যাঙ এবং অন্যটিকে ব্যাঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রী ব্যাঙ কল্পনা করা হয়। ব্যাঙ দুইটি যাহাতে পালাইতে না পারে তজ্জন্য একটি খুঁটিতে দড়ি দিয়া উহাদিগকে বাঁধিয়া রাখা হয়। হুদুমদেও -এর পূজা শেষ হইলে বাড়ী হইতে লইয়া যাওয়া বালতি বা লোটার জলে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া সরিষার তৈল দেহে মাখিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর একটি পিড়িতে বা আসনে বসাইয়া দুইজনের কপালে সিঁদুর মাখাইয়া দেওয়া হয়। ..... বিবাহ পর্ব সমাপ্তির পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।[৮] এক জন অসমীয়া লেখকের মতে পশ্চিম গোয়ালপাড়া জেলার ব্যাঙ এর বিয়ে ছাড়াও বন থেকে এক ধরণের হুদু পাখী এনেও পূজা করা হয়। "হুদুম পূজাত বনত থকা হুদুম (হুদু) চরাই ধরি আনি পূজা করা হয়।"[৯] কিন্তু পশ্চিম গোয়ালপাড়া জেলায় এধরণের হুদু পাখী (পেচা জাতীয়) হুদুম পূজায় প্রচলনের খবর গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে কোন রাজবংশী সমাজের লোকমুখে শুনতে পাইনি। সুতরাং অসমীয়া লেখকের এই মত এই পূজা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মনে হয় গ্রহণ যোগ্য নয়।

হুদুম দেও পূজা

এই পূজা প্রধানতঃ রাজবংশী ক্ষত্রিয় রমনীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। হুদুম দেও অর্থে দেবরাজ ইন্দ্রকেই বলা হয়ে থাকে। আলোচ্য প্রকল্পভুক্ত রাজবংশী সমাজের মধ্যে এই

ধারণাই প্রচলিত আছে ।

এই পূজা চৈত্র বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্র তাপে তাপিত ধরনীর বুকে বর্ষার আগমনকে কেন্দ্র করেই করা হয়ে থাকে । গ্রামবাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষকদের কাছে ক্ষেতের জন্য বর্ষন অপরিহার্য্য । চাষের জন্য যখন বর্ষার জল প্রয়োজন অথচ বর্ষা আসতে বিলম্ব হচ্ছে সে ক্ষেত্রে কৃষক রমনী বর্ষার দেবতা হুদুম দেও অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে পূজো দিয়ে আবাহনী গান গেয়ে সন্তুষ্ট করাতে প্রয়াস পায় ।

হুদুমদেও পূজার পদ্ধতি ।

গ্রামের কৃষক রমনীগণ রাত্রির প্রথম প্রহরের পরে গ্রামের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের এক নির্জন স্থানে একটি কলার চারা গাছ রোপন করে তার পাদদেশে একটি মাঙ্গলিক ঘট স্থাপন করে । এবং ঘট স্থাপনা করার পরে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে বর্ষার জন্য পূজো সেরে নেয় । এরপর চাষী রমনীরা নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র খন্ড (অন্তর্বাস ব্যতীত) সেই কলাগাছের চারার কাছে রেখে সেই কলাগাছের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচ ও গানে মত্ত হয় ।

এই অনুষ্ঠান ৩, ৭, ৯ দিন অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত না বর্ষার আগমন হয় ততদিন পর্য্যন্ত নিয়মিত প্রত্যহ চলতে থাকে । এই নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত চলতে থাকে । ঘট স্থাপনা করার পরে রমনীগণ সমবেত কণ্ঠে হুদুম দেও এর কাছে প্রার্থনা করে :——

হুদুম দেও হুদুম দেও
আমাক ফুটিক পানী দেও
আমার দেশত নাই পানী
জীবন ধরি টানাটানি ।

হুদুম দেওকে পূজো দেওয়া ও প্রার্থনা পর্ব সেরে নিয়ে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর থেকে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত চলে নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান । [১০]

হুদুম দেও পূজার গান ॥

ওকি দেবরাজ যেই না ঘাটে আতপ কলা ভাসে
ওকি দেবরাজ যেই না ঘাটে দুবা তুলসী ভাসে
ঐ না ঘাটে নামিয়া পূজা নেও মোর দেবরাও ও ॥

ওকি দেবরাজ যেই না ঘাটে জই জোগার পরে
ওকি দেবরাজ যেই না ঘাটে ঢাকের বাইজো পরে
ঐ না ঘাটে নামিয়া পূজা নেও মোর দেবরাজ ও ॥
ওকি দেবরাজ যেই না ঘাটে ধোমের খড়ি ভাসে
ওকি দেবরাজ যেই না ঘাটে ঘিয়ের বাতি জ্বলে
ঐ না ঘাটে নামিয়া পূজা নেও মোর দেবরাজ ও ॥

কালা মেঘ ধওলা মেঘ মেঘ সোদোর ভাই
এক ছিলকা পানী দেও গাও ধুবারি যাই ।
মেঘ বরষেরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেঘ বরষেরে
ধুধুয়া কাশিয়ার ফুল নদী হইল কানাই হুলুস্থুলরে

দেবরাজ ইন্দ্রকে অর্থাৎ হুদুম দেওকে বন্দনা করে গান গাওয়ার পর চাষী রমনীরা হুদুম দেও পূজার পরিপূরক গান হিসেবে গান গেয়ে নাচতে থাকে । ———

১

খিন খিনাছে কমোরটা মোর শির শিরাছে গাও,
কোটে খোনা গেইলে এলা হুদুমের দেখা পাও ।
পাটানিখান পড়িছে খসিয়া,
আইসেক রে হুদুম দেও
তোর বাদে মুই আছংরে বসিয়া
ডিং শাল শাল কমোরটা
তাতে নাই মোর ভাতারটা ;
করোং কি মুই কায় বা কয়
কোনটে গেইলে তার দেখা হয় ;
দেখা হইলে দেহাটা জুড়ায় ।

২

গোয়াল ননী গোয়াল ননী হাটিয়া আইসো ধীরে
ওরে রাজার ব্যাটা কানাইয়ারে
তোমাক ক্যানেবা ড্যাকাইচে ।
ওতোর গায়ের মাঙ্জোন দেখিয়ারে
ও তোক কেনে বা ড্যাকাইচে ।
ওরে হেমতী বিত্তিরি আরো ধান
ফেলাই নং জমীনে ।

ছাওয়াল রাজায় দিচে আরো পান
রাখেন যতনে রে ।
হেমতী বিন্তিরি আরো ধান
ফেলাই নং জমীনে ।
ওরে রইবার নওঁ মুই রইবার নওঁ
মুই যাইম কানাইয়ার সঙ্গেরে ।
হেমতী আরো বিন্তিরি ধান
ফেলাই নং জমীনে ।

দেবরাজের কল্যাণে বর্ষা এলে মাঠ ঘাট জলে একাকার হয়ে যায় আর চাষীরা মনের আনন্দে হেমতী বিন্তিরি ধানের চাষ আবাদ আরম্ভ করে এমন একটি সুখ স্বপ্নে রচিত গান এটি ।

দেবরাজের কল্যাণ বর্ষন পরিপুষ্ট সবুজ মাঠের ফসল একদিনে পেকে সোনালী হয়ে যায় । সেই সোনার ফসল কাটতে যাবে কৃষক রমনী তারই চলছে আলোজন । ——

৩

সাজিল গোয়াল ননীরে
সাজিল গোয়াল ননীরে
কাতি ছাড়ি আলোন পইল
ক্ষেতে পাকিল ধান
সাজিল গোয়াল ননীরে ।
হাতে নিল জলের ঝরি
মাথায় জলপান
সাজিল গোয়াল ননীরে ।

ধানকাটা হয়ে যায় সোনার ফসল নিয়ে চাষী তার ঘরে ফেরে :——

৪

গোয়াল ননী তোলে ধান
কানাই সাজায় গাড়ী
গাড়ীত সাজেয়া ধান
ফিরিয়া আইসে বাড়ী
ফিরিয়া আইলো গোয়াল ননীরে ।

৫

জাগরে জাগরে হুদুম আজিকার রাতি ,
গৃহস্থীয়া করে পূজা, দিয়া ধূপ চালনবাতি ।
আকাশতে কর পূজা আকাশ কাওনী
পাতালতে কর পূজা এককান নাগালি ।
কালা মেঘে ধলা মেঘে ডাকিয়া আন বারি
আন্ধারি করিয়া দেওয়া আইসে দাবারি ।
আন্ধার করি দেওয়ার বারি আয়রে,
কালা মেঘে দেওয়ার বারি আয়রে ।
আলো আলো রে হুদুম দেশোত আলোরে ।
আলোরে হুদুমেও যাও,
চালন বাতি বরিয়া নেও ।
আজি হুদুমের শুভদিন
কালা বারীত পারে নিন্দ্ ।
কালা বারীত পুরুসুরায় .
চালনীত ধরি গরমোরায় ।
হুদুমের মাও বন্দি হইনু মোর মারেয়ার জলেরে,
হুদুম হুদুমরে, হুদুমে কি কাজ করিলরে ।
হুদুমঘর সাত ভাই, করে আরো হাল কামাই ।
হুদুমঘর সাত ভাই কারো খেতত পানী নাই ।
আছে পানী গাঙতে, ঢালিয়া দিব জমিতে ।

৬

হাড়িয়া দাড়িয়া মেঘ কি সাজন সাজিয়া
গাঙের জলে গা ধুইম .... কি দিয়া ।
ধোলা মেঘ কালা মেঘ মেঘ .... তাই
এক চিলকা পানী দেও গাও ধুইয়া যাই ।
সাতজন হুদুমের নাই কারয় .... পানী নাই ।
আইস সপায় নাচন নাচি .... ত ভরেয়া । ১১

মদনকাম বা বাঁশ পূজা

মদনকাম পূজাকে বাঁশ পূজাও বলা হয়ে থাকে। রাজবংশী সমাজের মধ্যেই এই পূজার প্রচলন উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তবে গোয়ালপাড়া জেলার মুসলমান সমাজেও এই পূজার প্রচলন কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। তখন এই বাঁশ পূজাকেই মাদার পূজা বা 'ডাকা পূজা' বলে। মুসলমানের দ্বারা পূজা করার কথা যেহেতু ইসলামধর্ম বিরুদ্ধ কথা সেজন্য সন্তানহীন মুসলমান স্বামীস্ত্রী সন্তানকামনায় এই পূজা করার পর পুনরায় সমাজকে খাওয়া দিয়ে মুসলমান সমাজে ওঠে [১২]। গোয়ালপাড়া জেলার সংলগ্ন কামরূপ জেলায় এই পূজার নাম ওটেনী পূজা। ওটেনী পূজার উৎসবে সেখানে হিন্দু মুসলমান সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। সেখানে দুটো গোটা বাঁশকে স্বামী স্ত্রী হিসাবে কল্পনা করে নেয়া হয় অর্থাৎ এদেরমিলনে বংশ বৃদ্ধি হবে সেই কামনা করে বাঁশকে পূজো দেওয়া হয়। [১৩]

ডঃ গিরিশংকর রায় মদনকামকে শিব ও তার অনুচরীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এই কারণে যে রতির স্বামী কামদেব -এর এক নাম মদন এবং এই মদনদেবকেই শিব ভস্মীভূত করেছিলেন সেজন্য মদনভস্মকারী শিবই মদনকামে রূপান্তরিত হয়েছেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিতও নন। [১৪] কোচ রাজাদের কুল গুরু ছিলেন মদনমোহন। এই মদনমোহন কোচবিহার সহরে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে ১৮৮১ – ৯০ খৃষ্টাব্দে বৈরাগী দীঘির উত্তরে নির্মিত হয়। [১৫] এই মদনমোহন এর কষ্টিপাথরের মূর্তিটি কৃষ্ণের প্রচলিত মূর্তি সদৃশ তবে কৃষ্ণ এখানে একা রাধা অনুপস্থিত। এতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যেহেতু কামতা কোচবিহার রাজ্যে প্রবর্তিত প্রথম বৈষ্ণবধর্ম মত - এর প্রবক্তা শংকরদেব। এবং তিনি যে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন সেই কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা অনুপস্থিত। শংকরদেব প্রবর্তিত এক শরণ বৈষ্ণব ধর্ম এক সময় সমগ্র উত্তরবঙ্গে ও পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই কারণে মনে হয় মদনকাম এখানে শ্রীকৃষ্ণেরই সমার্থক দেবতাবিশেষ অবশ্য পরবর্তী কালে এই মদনদেবের পূজার রীতিতে – লোকায়ত জীবনের নানা ভাব অনুষঙ্গ প্রবেশলাভ করায় মদনকামকে শিবের অনুচরী দেবতা হিসাবে কল্পনা করাও একেবারে নিরর্থক নয় বলে মনে হয়।

মদনকাম পূজা পদ্ধতি।

চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী তিথি উপলক্ষে একাদিক্রমে চারদিন যাবৎ এই পূজা উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলার গ্রামে গঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশীর দিনে প্রথম পূজা

শুরু হয়। প্রথম দিনের পূজাকে 'বাঁশের কাপড়' দেওয়া বলে। এই পূজা উপলক্ষ্যে একটি 'বড় বাঁশ' –এর মাথায় কালো চামড় বেঁধে দেওয়া হয়। বাঁশটির গোড়ার দিকে দু হাত বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ বাঁশটিকে গাদা বা লাল গালুক কাপড় দিয়ে জড়ানো হয়। পূজোর সময় গৃহস্থের তুলসীমঞ্চের নিকটে চামড় সজ্জিত দুটি বাঁশকে খুটির সাথে বেঁধে রাখা হয় ও পরে সেখানে পূজা করা হয়। কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথির দিনে পূজোর শেষে মদনকামের এই বাঁশগুলিকে (বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার) ফাঁকা মাঠের ধারে কোন এক জলাশয়ের ধারে নিয়ে গিয়ে একটি বড় গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা হয়।

বাঁশকে জল খাওয়া।

পরে একটি নির্ধারিত সময়ে বাঁশগুলিকে কাঁধে নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জলাশয়ে চামড় শুদ্ধ মাথাটাকে চুবানো হয়। একেই বলে 'বাঁশেক জল খোয়া'। এরপর মদনকামের বাঁশ যে যার বাড়ীতে নিয়ে এসে আনুষঙ্গিক আচার শেষে বাঁশের চামড় ও কাপড় খুলে রাখা হয়।

যেখানে বাঁশকে জল খাওয়ানো পর্ব সমাপ্ত হয় সেই জলাশয়ের ধারে উন্মুক্ত মাঠে সারারাত ধরে চলে গানের আসর। যেহেতু রাত জেগে গানের আসর বসে তাই এই গানের নাম জাগ গান। আর আসরকে বলা হয় খলাবাড়ী। এই আসরে আদিরসাত্মক কানাই ধামালী বা কৃষ্ণ ধামালী পালা গান গাওয়া হয় এজন্য এই আসরে স্ত্রীলোক বা অল্প বয়স্ক বালকের পক্ষে প্রবেশ নিষেধ থাকে। এই জাগ গানের বিখ্যাত লোককবির মধ্যে রংপুর জেলার রাজবংশী কবি রতিরামদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। বাঁশপূজা উপলক্ষ্যে এখন আর পূর্বেকার মত সারারাত জেগে জাগ গানের আসর কদাচিৎ বসতে দেখা যায়।

বাঁশপূজার বা মদন কাম পূজাতে 'মৃত্তিকা সৃজন, ঘটস্থাপন কামদেবের সৃজন থেকে আরম্ভ করে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ গান গাওয়া হয়ে থাকে। গাদান অর্থাৎ পালাগানের গায়কেরা খোল ও করতাল যোগে এই সকল গান গেয়ে থাকে।

মৃত্তিকা সৃজন -এর গান

'জয় জয় বন্দং যগে বন্দং রাম।
প্রণাম করিয়া বন্দং গোসাইর চরণ॥
মৃত্তিকা সিজাইল গোসাই করিয়া যতন।
কর্ম্ম বানে জন্ম হইল ঠাকুর মদন রাম॥

দেব বন্দং ধরম বন্দং ধরম নৈরাকার ।

হরগৌরী মাধব বন্দং শিবের জটাভার ।।

<u>ঘটস্থাপনার গান</u>

জয় ধারেয়ারে

আজি ঘট বসাও সাবধানে

আনাও সুবর্ণের বাতি আনহ সত্বর ।

হাততে কাংকন নাই লজ্জা হেন বাসি

আনিয়া নেউজ পাত (কলাপাতার অগ্রভাগবিশেষ)

মারিস ধান পাতো তাত

তাহাতে আনিয়া ঘট করহ স্থাপন ।

আম জাম কদলীর ফল ।

দধি দুগ্ধ ঘটে জল

পূজা কর বাঁশের নানা পুষ্প দিয়া । ১৬

মনে হয় পূর্বে কার্পাস চাষ ও এতদ অঞ্চলের লোকে ধান্যচাষের মত আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গেই করত । নিম্নে বাঙার জন্মগানের উদাহরণ —

পয়ার : —

ভালা রামরে হায় হায়রে ।।

দক্ষিণে বাসুকা বন্দোং বামে কত্রীপাল ।

জীবের দ্বারা মহাপ্রভু সৃষ্টিতে জোরে হাল ।।

হাল দিয়া চাষ করে মই দিয়া ঢাকে ।

তাহার উপরে জীম বাঙা রোপন করে ।।

বাঙারোপন করিয়া জীম হৈল একপাশ ।

তিনদিনে আলায় (জন্ম) বাঙা হইল তিন পাক ।।

ডাল মেলি ফুল ধরে ধরিল চক্কুর ।

গোঁসাইর হুকুমে হইল চক্রেতে কাপড় ।।

সত্য যুগের কথাগুলা কলিযুগে কয় ।

কেহ বলে দেখি নাই কেহ বলে হয় ।।

কেহ নিল ধাসা বানাত কেহ নিল শারী (শাড়ী) ।

কামদেব নিল কাপড় পঞ্চিমা পাগড়ী ।।

বাঁশ কর্তনের গান :——

মদনকাম পূজার সময় যে বাঁশ কেটে নেয়া হয় তদুপলক্ষে গান । গীদালেরা তখন গান ধরে ;

কান্ধে বাইস কুড়ালনিয়া চলিল হাটিয়া ।
বড় বাশের আড়ায় গিয়া আরম্ভিল ঘাও ॥
বড় বাশ উঠিয়া করে সুমধুর রাও ।
মোক কাটিবার আসচিস — মালগীরি গায় করিয়া বল
এক ক্ষিত (কচি) আটকে রাখিস বেলা দুই প্রহর ।
দৈয়া বাশ কাটিতে যা যার পূব গিওর ॥
সেই সে সহিতে পারে শ্বেত চামরের ভর ।
জয় জয় বলিয়া বাশের গোড়ায় চোটাইল ॥
হরি হরি বলিয়া বাশ মাটিতে পড়িল ।
গোড়াখান ফেলাইল বাঁশের গুড়ুয়া বলিয়া ।
আগাল খান ফেলাইল বাঁশের আগালি বলিয়া ॥
মধ্য খান বাশের কান্ধে করিয়া লইল ।
বাশ লৈয়া মালগীরি গৃহে চলি গেল ॥
সেবিয়া পুড়িয়া বাশ করিল সিদা ।
বাশক স্নান করায় গঙ্গার জল দিয়া ॥
আম ডাল আনি বান্ধে হারিয়া চামর ।
তিন পার্শ্বে তিন খানি লাগাইল ডোর ॥
মনমধ্যে মালগীরি বাঁশত কাপড় ।
ঘট স্থাপন করে জোর করি হাত ॥
ঘট গচা চাইলন বাতি বৈরাতি এক জোড় ।
তোক বলং ওরে ব্যাটা মালগীরি বল ॥
মোর বাশ খেলাইতে নে দক্ষিন সাগর ।
দক্ষিন সাগরের লোক বলে হরি ॥
ধওলা পাটা ধুপ, সেন্দুর মদনের সেবা করি ॥
চারি পৃথিবী ফিরিয়া মধ্যে হইল খাড়া ।
চন্দন তুলিয়া মারিল আছড়া ॥

ত্রয়োদশীর দিনবাঁশ কর্ত্তন অনুষ্ঠানের পরেই কামদেবের পূজা আরম্ভ হয়। শাস্ত্র বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে পূজা আরম্ভ করা হয়। এবং চতুর্দ্দশীর দিনে হোম যজ্ঞাদি করা হয় ও প্রতিপদের দিন শেষ পূজা করা হয়। কেহ কেহ ব্রাহ্মণ পুরোহিত অভাবে ত্রয়োদশীর ও পূর্ণিমার কাজ নিজেরাই করেন। শুধু চতুর্দশীর দিন ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে পূজা ও হোম যজ্ঞাদি করিয়ে নেন। ত্রয়োদশীর পূজার দিন প্রথমে বাণে কাপড় দেওয়া (কাপড় পড়ানো) অনুষ্ঠান হয়। সেইদিন গায়কগণ কামদেবের জন্মকথা গান করেন।

কামদেবের জন্মকথা :——

ত্রিশকোটি দেবতার বন্দিলাম চরন।
কামদেব জন্ম হইল কৃষ্ণের নন্দন॥
উপজিল গোঁসাইর কুমার রমনীর উদরে।
ছেইলার রূপ দেখিয়া মূর্চ্ছাগত ঘরে॥
নাড়ী ছেদন করিলেন ধাইনি সকলে।
আস্তে আস্তে ছেইলাক তুলিয়া নইল কোলে॥
সুন্দর চন্দন মাখে এ পোড়া ভরিয়া।
ছেইলাকে স্নান করায় গঙ্গার জল দিয়া॥
হাতে পদ্ম, পায়ে পদ্ম, পদ্ম সর্বস্থান।
মণি মুকুট পরে কপালে চারি চাঁদ॥
ছেলেকে দেখিতে আইল যত দেবগণ।
জন্ম রাশি নাম রাখে মদনমোহন॥
বারো মাসে বারো তিথি নইছে বাটিয়া।
চৈত্র মাসে না নিল কেউ রাখাল বালিয়া॥
দেবগণ বলে শুন মদন গোপাল।
চৈত্র মাসে হইল হাওয়ালত।
যেই মাসে গৃহস্থের নাখাকিবে ভাত।
সেই মাসে কামদেব পূজা পাবি তাত॥
চৈত্রের মদন চন্দন ? চতুর্দ্দশীর দিনে ;
সেইদিনে পূজিবে সবজনে॥

• • • •

গলায় পুষ্পের মালা সুন্দর রূপ ধরি ।
পূজা খাইতে কামদেব গেল গৃহস্থের বাড়ী ॥
প্রথম বন্দোং বাশ গোঁসাইর চরণ ।
জাগ যজ্ঞ করে গোসাই হরষিত মন ।
জাগ যজ্ঞ করি গোসাই সাগরে ভাসাইল ।
নিত্যে নিত্যে বটগাছ সৃজন হইল ॥
চারিদিকে আড়া দিয়া সৃজায় বাঁশ বন ।
বাশ রোপন করে গোসাঞি হরষিত মন ।
এরুয়া বেরুয়া বাঁশ তরল থাকেনা ।
বড় বড় বাশ সৃজায় যার বড় হান্দারা ॥
ঘন ঘন গির তার বাঁশের ছারে ডাল ।
রাধা রাধা বলিয়া বাঁশী ডাকে সর্ব কাল ॥

বাঁশ পূজা বা মদনকাম পূজায় দেবতার উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকারের নাড়ু দিয়া নৈবেদ্য দিতে হয় । দুধ, চিনি, আতপ চাউলের গুড়া এই নাড়ু তৈয়ারীর প্রধান উপকরণ । ক্ষীর দ্বারা সাধারনত: পাঁচ প্রকারের নাড়ু তৈয়ার করা হয় । ভাঙ্গের গুড়া মিশ্রিত নাড়ু মদনকাম পূজার নৈবেদ্য এর অপরিহার্য্য উপকরণ । ভাঙ্গ মিশ্রিত নাড়ুর প্রসাদ ছোট ছেলেমেয়েদের কম পরিমানে দেওয়া হয় । এই নাড়ু বেশী পরিমান খেলে রীতিমত নেশা হয় । এবং পূজাবাড়ীর মেয়েরা যখন নাড়ু তৈয়ার করে তখন গীদানে গান ধরে । গানের অংশগুলি নিম্নরূপে দেওয়া হোল :—

পয়ার :—

হরি বল, হরি বল, হরি রাম ॥
"উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিকোন বন্দি সাথে ।
এদেশে না আছিল ভাং আনিল গোরক্ষ নাথে ॥
ভাং আনিল ঝোলৎ করি বীজ আনিল সাথে ।
সেই না ভাঙের বীজ হইল ক্ষেতে ক্ষেতে ॥
পরথম কার্তিক মাস ভাঙ্গের জনম ।
বিনা চাষে বিনা মইয়ে যেম ববম ॥
বাড়িয়াছে ভাঙ্গের আগা বাড়িয়াছে মুয়া ।
চৈত্র মাস পড়িয়া গেল ভাং হইল জটিয়া ॥
ভাং কাটিতে সাজিল ভাল ভাল গাও বুড়া
হাতে দাও নিয়া সবে আসিল সাজিয়া ॥

গোড়াতে চেষ্টাইল ভাঙের আগাল ঢুলিল ।
হরি হরি বলিয়া ভাং ডুবিতে পড়িল ॥
আঁটি আঁটি বান্দে ভাং বোঝায় বোঝায় বান্দে ।
কান্ধে করিয়া ভাং বাড়ী নিয়া আইলে ॥
গঙ্গার জল দিয়া ভাঙোক স্নান করাইল ।
সূর্যাইর কিরণে ভাঙোক শুকাইয়া নইল ॥
খোলায় ফেলেয়া ভাঙোক করিল, ভাজা ভজা ।
ঢেকিতে ফেলেয়া ভাঙের হাড় করিল গুড়া ॥
বাইশ খান ঢেকারে তার তেইশ খান কুলা ।
টেকিয়া টুকিয়া নইল ঝাটিয়া ভাঙের গুরা ॥
আলো চাউল গাভীর দুধে ভাঙ করিল শুধ ।
তাহাতে দেখিয়া দিল চিনি সাগর দুধ ॥
ভাটী হাতে আইল বামনী ? কুচুনী হাতে পিতলের খাড়ু ।
সেইসে বানাইতে পারে মদনকামের নাড়ু ॥
নাড়ু তৈয়ার করি সে নিষ্ঠা করি মন ।
থরে থরে সাজায় নাড়ু এ পঞ্চ বরণ ॥
নানা রূপ দ্রব্য দিয়া সাজাইল নাড়ু ।
সেই নাড়ু পূজিতে আইল মদনকামের লেরু ॥

বাঁশ পূজা বা মদন উৎসব এতদ অঞ্চলের বিবাহিত নরনারীর একটি আনন্দ উৎসব বিশেষ । উৎসব মুখর আবহাওয়ায় ভাঙের নাড়ু ভক্ষণে নরনারীর মনে চিরন্তন কামনাকে উদ্দীপিত করে । সম্ভবতঃ সেই কারণেই শিব পূজার উপকরণ ভাঙকে মদনকাম পূজার উপকরণের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে যুক্ত করা হয়েছে । আবার শিব উপাসক সিদ্ধ গোরক্ষনাথকেও নাড়ু সোজা (তৈরী) গানে যুক্ত করা হয়ে । "নাড়ু সোজা গানে" সকল দেবতা, মুনী, ঋষি, নদনদীকে ভাঙ ভক্ষণ করানো হয়েছে ।

<u>নাড়ু সোজা গান</u>

পয়ার : ———

ভাঙ খাও, ভাঙ খাও, আসিয়া রে ॥
পরথমে খাইল ভাঙ আদি নিরঞ্জন ।
তারপরে খাইল ভাঙ যত দেবগন ॥
সত্য যুগে খাইল ভাঙ বিষ্ণু অবতার ।

ত্রেতা যুগে খাইল ভাও রাম রঘুবর ॥
দ্বাপরেতে খাইল ভাও কৃষ্ণ অবতার ।
ধর্ম খাইল, কর্ম খাইল, খাইল বসুমতী ।
নন্দীর দুই পুত্র খাইল কাল নরপতি ॥
হংস বাহনে খাইল ভাং গজে পুরুন্দর ।
বাসুয়া বাহনে খাইল ভাং ভোলা মহেশ্বর ॥
কার্ত্তিক গণেশ খাইল ভাং চণ্ডীর দুই পুত ।
মহিষের পৃষ্ঠে চড়িয়া খাইল যম, রবি সুত ॥
যমরাজা খাইল ভাং মহিষে চড়িয়া ।
যমদূত কালদূত খাইল ভাং লোহার মুন্দর দিয়া ॥
কামদেব খাইল ভাং হরষিত মন ।
মারেয়ার বাসরে আজি হইবে মিলন ॥

***   ***   ***

পূর্বে রাজা খাইল ভাং ভানু ভাস্কর (
উত্তরে কালিকা খাইল দক্ষিণে সাগর ॥
পশ্চিমেতে খাইল ভাং পারুয়া মোকাম ।
সত্যের তার না নরে কুচির কোরান ॥
নারদ মুনী খাইল ভাং মুনী মহাশয় ।
তোরসা নীদ খাইল ভাং জলে ঝরা বয় ॥
ধরলা নদী খাইল ভাং ধন ধারা ধান বয় ।
বরমোপুত্র খাইল ভাং ~~ন~~ নদী মহাশয় ॥

***   ***   ***

এতদেব খাইতে ভাং যে দেব এড়ায় ।
লক্ষ লক্ষ ~~প্রণাম~~ প্রণাম জানাই সেই দেবের পায় ॥
নাড়ু সোজা গান এখন হইল সমাপন ।
প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি হরি বল ॥

প্রতিপদের দিন সূর্যাস্তের পর মদনকামের বাঁশে জল দিয়ে "বাঁশ" গুলিকে আনার পর তখন গান ধরা হয় ।

আসিল আসিলরে গোপালগীরি আসিলরে ।
আইসরে মারেয়ার যাও গোপালক বরিয়া নেও ॥
হাপুসি আসিল মদনকাম গচা নাগেয়া দেও ।
যায় ধরিবে চাইলন বাতি
তায় পাইবে বর পাহারাতি ॥ [৬]

এই ভাবে মদনকাম বা বাঁশপূজার গানের পর্ব ও সমাপ্ত হয় ।

—

লৌকিক দেবতা

কোচ-রাজবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

কোচবিহার অঞ্চলের বড় দেবী। কোচবিহার রাজপ্রাসাদ-এর দক্ষিণে দেবীবাড়ী পাড়ায় অবস্থিত।

কোচবিহার শহরের বড়দেবী পূজা

কোচবিহির দেবীবাড়ীর দুর্গা প্রতিমার এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা বাংলা কিংবা ভারতের আর কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না। প্রথমতঃ দেবীর গায়ের রং ঘোর রক্ত বর্ণ, বিশাল চক্ষুদ্বয় ঊর্ধ্বে উন্মিলীত। সিংহের পৃষ্ঠদেশে থাকে দেবীর ডান পা এবং বাঁ পা থাকে মহিষের পৃষ্ঠে। অসুরের দক্ষিণ বাহু থাকে সিংহের মুখ গহ্বরে, বাঁম বাহু ব্যাঘ্রের মুখ বিবরে।

দুর্গা প্রতিমার দুধারে জয়া ও বিজয়া মূর্ত্তি। লক্ষ্মী, সরস্বতী কার্ত্তিক এবং গণেশ-এর মূর্ত্তি এই পূজায় থাকে অনুপস্থিত। এবং কোচবিহার শহরে মহারাজাদের প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিমাকে বলা হয় বড়দেবী। দেবীর আবাস গৃহকে বলা হয় দেবীবাড়ী। দুর্গা প্রতিমাকে এখানে বলে দেবী ঠাকুর অর্থাৎ দেবী প্রতিমা। কোচবিহারের প্রাচীন লোকেরা এই পূজাকে ভবানী পূজা বলেও অভিহিত করেন। কোচবিহার শহরের মদন মোহন বাড়ীতে দুর্গা পূজার সময় প্রচলিত দুর্গা প্রতিমার পৃথকভাবে পূজা করা হয়। মদনমোহন বাড়ীতে দেবীবাড়ীর প্রতিমার মত যে ভবানী মূর্ত্তি আছে তাকেও এসময় পৃথক ভাবে পূজা করা হয়। গন্ধর্ব নারায়নের বংশাবলী গ্রন্থে বর্ণিত দেবীর যে রূপ বর্ণনা আছে তার সাথে দেবীবাড়ীর এই প্রতিমার সেই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন সেখানে বলা হয়েছে :——

দশখানি বাহু বক্ত হয় একখান।
তিন গোটা চক্ষু অতি দেখিতে সুধান॥
যুবতীর বেশ শোভে অলঙ্কর গণ।
সিংহের উপরত আছে দক্ষিন চরণ॥
মহিষ পৃষ্ঠত বাম চরণ থাপিলা।
মহিষর কাটা গলে পুরুষ জন্মিলা॥
দৃঢ়মুষ্ঠি পুরুষর কেশত ধরিলা।
দক্ষ হস্তে হৃদয়ত ত্রিশূল ভেদিলা॥
বাম হস্তে অসুরর ব্যাঘ্রে কামোরিলা।
দন্তে নিকোটিয়া দুষ্টে প্রানক ছাড়িলা॥
চক্ষু ঢেন করি দুষ্ট রুধিরে ছাদিলা।
দশখান অস্ত্র দশ অস্ত্রত ধরিলা॥ [১৭]

মহারাজাদের রাজপুরোহিত চারুকেশ চক্রবর্ত্তী ছিলেন মহারাজার আমলের শেষ পূজারী।

ওনার বদলে বর্তমান মদনমোহনবাড়ীর পূজারী কমলেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই দেবীর পূজা করেন এই দেবী পূজার বৈশিষ্ট ভ রতের জন্য যে কোনো স্থানের দুর্গাপূজার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। কোচবিহার সহরে এই বড় দেবী বাড়ীর পূজা কবে থেকে সুরু হয় তার সঠিক তথ্য জানা না গেলেও এই কোচবিহার রাজবংশের দিগবিজয়ী মহারাজা নরনারায়ণ যে এই বংশের এবং এই রাজ্যের প্রথম (তদানীন্তন কামরূপ কামতারাজ্য) দেবীপূজার প্রবর্তন করেন তার সঠিক সন তারিখ পন্ডিতমহলে বিদিত বিষয়। বিখ্যাত পন্ডিত হেমবড়ুয়া বলেছেন"

THE EARLIEST HISTORICAL RECORD OF HOW KAMAKHYĀ WAS ACCEPTE AS DURGA IS EVIDENT FROM THE INSCRIPTION OF KING NARANĀRĀYAN OF THE KOCHES WHO BUILT THE TEMPLE FOR THE DEITY IN 1565 AFTER THE ORIGINAL TEMPLE WAS DESTROYED BY MUSHLIM INVADERS."[২৮]

কামাখ্যা মন্দিরের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ লিপির ইংরেজী অনুবাদ হেমবড়ুয়া তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে যা দিয়েছেন তা হোল :——

. . . . . . HE (NARANĀRĀYAN) IS AS BRIGHT AS KANDARPA, HE IS A WORSHIPER OF KĀMĀKHYĀ. HIS BROTHER SUKLADHAS BUILT THIS TEMPLE OF BRIGHT STONES ON THE NILAHILLOCK FOR THE WORSHIP OF THE GODDESS DURGA IN 1487 SAK (1563)

দরঙ রাজ বংশাবলীতে মহারাজ নরনারায়ণের পিতা এবং কোচরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিশুসিংহের ও দুর্গাপূজার উল্লেখে দেখতে পাওয়া যায় :——

> "কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা বিশু সিংহই সরুতে বর গরন্তীয়া অবস্থাতে দুর্গাব পূজা করিছিল। [১১]

এই দেবী পূজার সূচনাপর্ব মহাষ্টমী প্রায় পূজার দুমাস আগে থেকেই আরম্ভ হয়। শ্রাবন কিংবা ভাদ্র মাসের শুক্ল শুক্লাষ্টমীতে হয় দেবীর 'শক্তি সংগ্রহ'। এই শক্তি হোল দেবীমূর্তির মূল কাঠামোর শিরোদাঁড়া বিশেষ। বিশেষ গুণ যুক্ত সারে সাত হাত উচ্চতা-বিশিষ্ট ময়না গাছের অংশবিশেষ বন থেকে পূজোদিয়ে কেটে নিয়ে আসা হোত। এই ময়না

পাছের পুজোয় আগে জোর পাঠা বলি দেওয়ার রীতি ছিল । বর্তমানে তার বদলে বলি হয় জোরা পায়রা । এই সারে সাত হাত ময়না কাঠ পুজো দিয়ে নিয়ে আসা হোত ডাঙ্গর আই দীঘির পশ্চিমপারে অবস্থিত গুঞ্জবাড়ীর মন্দির প্রাঙ্গন । তার পর সকালের দিকে কাঠে খড় ও নতুন কাপড় জরিয়ে আবার পুজো করা হয় । ~~অপ~~ অপরাহ্নে মদনমোহন বাড়ী থেকে পাইক, বরকান্দাজ, সিপাহী শানার কাড়া-নাকড়া সানাই বাজিয়ে দারবক্সী পাল্কী নিয়ে জল আসেন শক্তিরূপী যূপ কাষ্ঠকে নিয়ে যাবার ~~জন্য~~ জন্য । বর্তমানে সে রীতি নেই । তথাপি মাপের ময়না কাঠ এখনো আনা হয় 'শক্তি' বা মূল কাঠামো তৈরী করার জন্য রাধাষ্টমীতে মদনমোহন বাড়ী থেকে পাল্কীতে করে সেই ধূপকাঠ আনা হয় দেবীবাড়ীতে । সঙ্গে থাকে পাইক বরকান্দাজদের শোভাযাত্রা । এরপর ধর্মপাঠ পুজো করা হয় । এর তিনদিন পর খড় ও মাটি দিয়ে বড় দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরী সুরু হয় । কলিছাড়া ফুল ও বেলপাতা দিয়ে নিত্য পুজা হয় মহালয়া । অমাবস্যা পর্যন্ত যতদিন না পরিসমাপ্ত হয় মূর্তি তৈরীর কাজ ।

আগে কোচবিহারের স্থানীয় মালীরাই তৈরী করতেন এই ~~শুভ~~ প্রতিমা । তাদের জমি জায়গীরের বন্দোবস্ত ছিল । শেষ জায়গীরদার ছিলেন চন্দ্রমোহন রমাকান্ত ও ফিতিন চিত্রকর । বর্তমানে এরা নেই । রমাকান্ত চিত্রকরের ছেলে ছরকান্ত দাস আছেন, কিন্তু তার ~~ম~~ মহারাজ প্রদত্ত জায়গীরদার আর নেই । বর্তমানে এই বড়দেবী প্রতিমা নির্মানের কাজে লিপ্ত আছেন শিশিন চিত্রকরের নেতৃত্বেগঠিত একটি মালীর দল । এরা হলেন খগেন দাস, ছরকান্ত দাস, রজন ও ভবেন দাস । বাৎসরিক চুক্তিতে এদের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে দের হাজার টাকার অর্থ বরাদ্দ । বলাই বাহুল্য পাঁচ জন মৃত্ শিল্পীর সারাবছরের বেতন এই মত সামান্য টাকায় মোটেই মানান সহ নয় । কোচবিহার সহরের উত্তরে ডোডেয়ার হাটের বাসিন্দা এরা সবাই ।

বড়দেবীর মুখমন্ডল তৈরীর কাজে লাগে তুফানগঞ্জ মহকুমা সহর সংলগ্ন চামটা গ্রামের মাটি । বর্তমানেও এনিয়ম বজায় আছে । এজন্য চামটার দোলায় কদম ~~জ~~ গাছ ও ময়না গাছ আছে এমন একটি মহারাজার খাসডাঙা জমিতে মাটি তুলবার জন্য প্রয়োজনীয় পুজোর ব্যবস্থা আছে । পুজোর উপাচার কবুতর, দৈ-চিড়া ও হাসের ডিম । এজন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতর দরকার নেই । শুধু চিত্রকর অর্থাৎ মালী হলেই হোল । দেবীর পেছনেকার কাজকে 'ম্যাপথেরুয়া' বলে । দেবীর অলংকারাদি সব সোনার তৈরী । অস্ত্র গুলি সবই কাঠের হয় । দশ হাতে দশ অস্ত্র থাকে । অস্ত্রের রং লাল হয় । পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে দেবীর সঙ্গে বাঘ ও সিংহ দুটোই থাকবে । মহালয়ার দিন প্রতিমা নির্মানের কাজ সমাপ্ত হবে শুক্লা প্রতিপদে দেবীবাড়ীতে ঘটস্থাপন করা হবে । সেদিন থেকেই ঘটের উপর

বড় দেবীর পূজা সুরু হয় । ঘটস্থাপনের কাজ যারা আগে করতেন তাদের জাইগীর ছিল । বর্ত্তমানে নেই । তথাপি সেই পরিবারভুক্ত লোকেরা এখনও ঘটস্থাপনের কাজ করেই চলেছেন । বর্ত্তমানে এ কাজে ব্রতী আছেন বিপিনবিহারী দাস । ঐ ঘটের উপর থেকে প্রতিপদে পূজা সুরু হয় । সেদিন কোচবিহার সহর সংলগ্ন খাগড়াবাড়ী গ্রামের পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মনদের পরিবার ভুক্ত লোকেরা বিভিন্ন ধরনের ব্রত পাঠ করেন । এই ব্রতপাঠে ১৭।১৮ জন বা তারও বেশী নিয়োজিত থাকেন । এরাঁ দুর্গানাম-ত্র জপ করেন ও গীতা পাঠ করেন । এজন্য তাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত দক্ষিণা দেয়া হয় । দক্ষিনা বস্ত্র ও অর্থে দেয়া হয় । সকালের দিকে প্রতিপদ থেকেই সুরু হয় পাঠা বলি । দ্বিতীয়ার দিন থেকেই সকালে পূজার সঙ্গে "দেও দেখা" প্রথা আছে । অর্থাৎ দেবী দর্শন । দেও দেখা কাজ করেন প্রধানত তিনজনে মিলে । এঁরা হলে রাজপুরোহিত, দ্বারপন্ডিত ও দুয়ার বক্সি । বর্ত্তমানে যারা একাজ করেন তারা হলেন যথাক্রমে কমলেশ নাথ ভট্টাচার্য্য, রমাশংকর ভট্টাচার্য্য ও অমিতকুমার দেব বক্সী

এই ঘট পূজার কাজ চলবে তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর সকাল পর্য্যন্ত । ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে হয় বিল্ববরণ । এই বিল্ব ফল আছে কোচবিহার সহরের উত্তর পূর্বে ১৮ কিঃমিঃ দূরের বানেশ্বর থেকে । বানেশ্বরের শিব মন্দিরের পবিত্র বিল্বফল । এই ফল আনতে যায় দেওকুমার ও দেবীবাড়ীর দেউরী । সেদিন বিল্ববৃক্ষের পূজো করেন বানেশ্বর ধামের (মন্দিরের) মৈথিলী পুরোহিত । সন্ধ্যাবেলা সেই বিল্বফল পুঞ্জবাড়ীর ভান্ডার আই ঠাকুর বাড়ীর কাছেই বিশেষভাবে রাখা হয় । পরে সেই বিল্বফল টিকে দুয়ার বক্সীর নেতৃত্বে বরকন্দাজ, বাদ্যকর নাগড়া বাজিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন বড়দেবী বাড়ীতে । এই ফল নিয়ে আসে দেওকুমার । সেদিন আরোও একটি বিল্বফল নিয়ে আসেন বড়দেবী বাড়ীর দেউরী মদনমোহন বাড়ীর' কাঠামীয়া দেবী' পূজার জন্য ।

এই বিল্ববরনের দিন (ষষ্ঠীতে) সায়ংকালে দেবীমন্দিরে যথারীতি পূজা-অর্চ্চনা হবে । মূর্ত্তির পূজো সুরু হয় সপ্তমীর দিন থেকে । সেদিন সকালে ৭ জন পূজারী পন্ডিত ব্রাহ্মণকে বরণ করা হয় । পুরোহিত বরণের পর মূর্ত্তির উপরে সপ্তমী পূজা সুরু হয় ।

সপ্তমীর দিন 'হোমকুন্ড' নির্মান করে দেবেন 'কামসানাইগণ' । এই হোমকুন্ডের পরিমিতি ২৬" বা পৌনে দুই হাত । সপ্তমীর দিন হোমের সাথে সাথে পূজোর সুরু হোন । হোম করেন পাঁচজন পুরোহিত । এদের পদ্ধতিগত (TECHNICAL) নাম হোল ব্রহ্ম, ঋত্বিক, শুধু পুরোহিত সদস্য ও উপসদস্য । তিনদিনে অর্থাৎ সপ্তমী, অষ্টমী, ও নবমীর মধ্যে ১ লক্ষ হোম সমাপন পরিচালনা করবেন এই ব্রতী ব্রাহ্মণেরা । ব্রহ্ম ও ঋত্বিক হো মকে

প্রজ্বলিত করাবেন। হোমকুণ্ড পরিচর্য্যা করেবন 'অগ্নিরক্ষী' ব্রাহ্মণেরা। এরা খাগড়া বাড়ীর পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ নন। এরা মৈথিলী ব্রাহ্মণ।

<u>নেত্রদান পূজা :—</u> সপ্তমীর দিন সকালে হয় নেত্রদান পূজা। এই পূজায় পাঠা ও কবুতর বলির প্রচলন আছে। সেদিন সকালেই দেবীর নেত্রদানের কাজ সম্পন্ন হয় এই পূজোর মাধ্যমে।

<u>টানাটানি পূজা :—</u> সন্ধ্যায় হয় টানাটানি পূজা। মহারাজার রাজত্বকালে এই পূজার জন্য দুটি ঘর নির্দ্দিষ্ট থাকত। পূজার জন্য নির্দিষ্ট দড়িকে (পাট নির্মিত) একঘর থেকে আর এক ঘরে নিয়ে যাওয়া হোত। বর্ত্তমানে একটি ঘর থাকায় টানাটানি পূজার কাজ হয় ঠিকই তবে টানাটানি আর হয় না। টানাটানি পূজায় দুয়ারবক্সী বর্ত্তমানে এই পূজোর সময় দড়ি স্পর্শ করেন মাত্র।

<u>সরকারী পুষ্পাঞ্জলি :—</u> অষ্টমীর দিন হয় সরকারী পুষ্পাঞ্জলী। পূর্বে মহারাজাই স্বয়ং দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসতেন। বর্ত্তমানে মহারাজার অনুপস্থিতিতে দুয়ার বক্সী অমিয়কুমার দেববক্সী মহাশয়ই এই সরকারী পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর সুরু হয় দিনের চার প্রহরের পূজা। এই চার প্রহরের পূজায় আগে পাঠা বলি হোত বর্ত্তমানে পায়রা বলি হয়। মহারাজার আমলে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে তিনদিনই মহিষ বলি হোত। বর্ত্তমানে শুধু অষ্টমীর দিনই মহিষ বলি দেওয়া হয়। দিনের চার প্রহরের পূজার পর রাতের চার প্রহরের পূজাতেও পাঠার পরিবর্তে পায়রা বলি হয়।

<u>সন্ধি পূজা :—</u> অষ্টমী ও নবমীর মধ্যবর্তী তিথিতে সন্ধি পূজা হয়। সন্ধি পূজায় পাঠা ও কবুতর দুইই ই বলি হয়।

<u>নিশা পূজা :—</u> বড়দেবীর নিশাপূজা হয় তিথি হিসাবে। এখানেও পাঠা ও কবুতর দুইই বলি হয়। নিশাপূজার সঙ্গে সঙ্গে হয় গুপ্ত পূজা এই গুপ্ত পূজায় পূর্বে নরবলির প্রথা ছিল। বলে অনুমিত হয়। [১০]

(নরবলির মূল উদ্দেশ্য ~~নররক্ত প্রদান করা। সেই নরবলি না হলেও নররক্তের পিপাসা মিটাবার জন্য~~) কামসানাইর রক্তদান :— নরবলির মূল উদ্দেশ্য নররক্ত প্রদান করা।[১১]

সেই নরবলি না হলেও নররক্তের পিপাসা মিটাবার জন্য আছেন 'কামসানাই' উত্তরাধিকারী ব্যক্তি। এজন্য সরকার থেকে তার জন্য বাৎসরিক মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ হোল একশত টাকা। কামসানাই গভীর রাতে দেবীর সম্মুখভাগে আসেন রক্তাহুতি দেবার জন্য। সে সময়

দেবী মন্দিরের সম্মুখভাগ পর্দা দিয়ে পরিবৃত করে রাখা হয়। এই গুপ্ত পূজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন কামসানাই ব্যতীত আরোও দুজন। তারা হলেন প্রধান পুরোহিত ও দুয়ার বক্সী। বর্তমানে বানেশর মন্দিরের পূবে কালজানী গ্রামনিবাসী সুরেন্দ্র নাথ নায়েক (রাজবংশী ক্ষত্রিয়) কামসানাই বৃত্তিতে নিয়োজিত আছেন। এর পূর্ব-পুরুষরাও তাই ছিলেন। মহারাজার আমলে জায়গীর ছিল বর্তমানে তা আর নেই।

চালিয়াবাটিয়া পূজা :— এই গুপ্তপূজা চলাকালীন দেবী মন্দির সংলগ্ন আর এক স্থানে পরিচালিত হয় 'চালিয়াবাটিয়া পূজা'। এই পূজার মুখ্য পূজারী হলেন রাজবংশীক্ষত্রিয় সমাজের হালুয়া উপাধিধারী ব্যক্তি।

এই পূজায় পূর্বে শূকর বলি দেওয়া যেত। এখন তার বদলে হয় চন্দনকাঠ ও পাঠাবলি। এই পূজায় ভোগ দিতে লাগে খিচুরী কিন্তু খিচুরী সাথে মিশ্রিত হবে ভাট ফুল।

হনুমান দন্ড পূজা :— সেদিনই আর একটি পূজা হয়। তাকে বলে 'দন্ড ম পূজা' বা 'হনুমানদন্ড পূজা'। পূর্বেই উল্লেখিত 'হালয়া' উপাধিধারী রাজবংশী ক্ষত্রিয় ব্যক্তিই করবেন এই দন্ডপূজা দন্ড হোল হ হনুমানের আকৃতি অনুকরণে নির্মিত একটি রূপোর দন্ড হোল এই হনুমান দন্ড। এই দন্ডটি সুরক্ষিত থাকে মদনমোহন বাড়ীতে। তাকে দেবীবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয় মহাষ্টমীর দিন সকালে ব দন্ডটির পূজা পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সারাদিন ও রাত্রি দেবীবাড়ীতে থাকবে। দন্ডটি দেবীবাড়ীতে নিয়ে যাবার সময় যথারীতি বাদ্যভান্ড ও শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয়। অষ্টমী পূজার শেষে নবমীর ঊষা প্রহরে পুনরায় দন্ডটিকে মদনমোহন বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে যথাস্থানে সংরক্ষিত হয়।

বোয়ালমাছ সহকারে খিচুরী :— নবমীর দিন সকালে পূর্ণাহুতি হবে হোমকুন্ডের। পূর্বে উল্লিখিত ব্রতী ব্রাহ্মণেরাই এই কাজ পরিচালনা করবেন। পূর্ণাহুতি পর্বে পাঠা বলি হবে পাঁচটি ; এবং সঙ্গে সঙ্গে বলি হবে একটি কচ্ছপও। নবমী পূজার দিন যে খিচুরী ভোগ হবে তাতে মিশ্রিত হবে বোয়ালমাছ ও পাঠার মাংস। প্রতিপদ থেকে অষ্টমী পর্যন্ত পায়েস অর্থাৎ মিষ্টান্ন থাকবে প্রতিদিন।

যাত্রাপূজা :— দশমীর দিন যাত্রাপূজা। মহারাজার পূর্ন রাজত্বকালে স্বর্গীয় জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ন ভূপবাহাদুরের সময় ১৯৫০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজবাড়ীতে হোত অস্ত্রপূজা। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াশালের ঘোড়া ও হাতীশালের হাতীরও পূজা হোত। এসময় ঘোড়া ও হাতীকে খেতে দেওয়া হোত। যাত্রাপূজার শেষে বলিদান হোত পাঠা ও কাছিম।

খঞ্জন দর্শন :— যাত্রা পূজার শেষে হোত খঞ্জন দর্শন পর্ব । সুসজ্জিত পাটহাতীর উপরে রত্নসিংহাসনে মহারাজা করতেন উপবেশন । মহারাজার সামনে থাকত পদ্ম পাতারই উপরে নববস্ত্রে সুসজ্জিত রৌপ্যনির্মিত অংকুশ । সেখানে রাখা হোত ছোট্ট একটি খঞ্জন পাখী। মহারাজা অগণিত প্রজাপুঞ্জের সামনেই ছেড়ে দিতেন সেই পাখীকে । পাখী কোনদিকে উড়ে যায় মহারাজা জানতে চাইতেন এর মঙ্গল অমঙ্গলের কথা তাঁর নিযুক্ত রাজপন্ডিতদের কাছে । রাজ্যের শুভঅশুভ বিচার করতে বসতেন তখন সেই সভাপন্ডিতদের দল । দ্বারবক্সী অমিয় দেববক্সীর হিসেবে এই পর্বের আনুষ্ঠানিক রীতি বজায় ছিল ১৯৬৯ খৃঃ ত অবধি ।

বর্ত্তমানে মহারাজার পক্ষে খঞ্জন দর্শনের আনুষ্ঠানিক পর্ব সমাপন করেন দ্বারবক্সী অমিয় দেব বক্সী মহাশয় । খঞ্জন পাখীকে ছেড়ে দেবার পর রাজবাড়ীর রূপোর কিরিচ (তরোয়াল) দিয়ে একটা কুষ্মান্ড বলি দিতে হোত । বর্ত্তমানে দুয়ারবক্সী এ কাজ সমাধান করেন ।

<u>অপরাজিতা পূজা</u> :—— দশমীর দিনের আর একটি পূজা হয় তাকে বলে অপরাজিতা পূজা । আগে রাজবাড়ীতে হোত । বর্ত্তমানে এই পূজাপর্ব মদনমোহন বাড়ীতেই করা হয় । যাত্রাপূজার মতনই তবে খঞ্জন দর্শন ব্যাতীত আর প্রায় সবই একরকম থাকে ।

<u>ঘাট পূজা :</u>— দশমীর দিন বড়দেবীর বিসর্জ্জন পর্ব । মহারাজার আমলে সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই তোর্ষা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হোত । বর্ত্তমানে সকাল ১০টার মধ্যে কোচবিহার সহরের পশ্চিমে অবস্থিত তোর্ষা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয় । সে সময় দেবীকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে করা হয় ঘাটপূজা । ওখানে বিসর্জনের পূর্বমুহূর্তে চন্দনছাড়ি (শূকরের পরিবর্তে) ও পায়রা বলি দিয়ে ঘাট পূজা সম্পন্ন করেন রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের হালুয়া উপাধিধারী ব্যক্তি ।

বানা পূজা :— মহাষ্টমী পূজার এক মাস পরে যে শুক্লাষ্টমী যেদিন সাধারনতঃ জগদ্ধাত্রী পূজা হয় সেদিন ঐ বড়দেবীর মন্দিরে হয় বানাপূজা । এই পূজায় মদনমোহন বাড়ী থেকে রৌপ্য নির্মিত হনুমান দন্ডটিকে বাদ্যভান্ড সহকারে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে দন্ডটিকে রেখে করা হয় বানাপূজা । এটাই বড়দেবীর শেষ পূজা । যেদিন ভোগের মধ্যে থাকে খিচুরী ও পায়রা বলি । সেদিন হনুমান দন্ডের পাশে একটি উড়ুন গাছের ডালকেও (জাম গাছ জাতীয়) রাখা হয় পূজার জন্য । এই পূজার কাজও সমাধা করেন রাজ পুরোহিত ।

শ্রাবণ কিংবা ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে সারে সাত হাত ময়নাগাছের কাষ্ঠ কে দেবীর 'শক্তি' হিসেবে পূজো দিয়ে সংগ্রহ করে যে বড় দেবী পূজার সূচনা হয় তার প্রায় তিনমাস পরে বানাপূজার মাধ্যমে হয় সেই মহাপূজা কোচ রাজবংশের বহু শতাব্দীর মহিমময় ঐতিহ্যমন্ডিত বড়দেবীবাড়ীর পূজার পরিসমাপ্তি । [২২]

প্রমাণ পঞ্জী

১। ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সপ্তর্ষি'– লোকসাহিত্য সংখ্যা। ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

২, ৩। স্কন্ধ পুরাণ

৪। কাতিপুজা সম্পর্কে লোকাচার মূলক বিষয় ও গানের অংশগুলি প্রধানতঃ সংগ্রহ করে দিয়েছেন তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামের তিলেশ্বরী বর্মনী ও উমেশ্বরী বর্মনী ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে।

৫। গোয়ালপাড়া জেলার কৈবর্ত্ত সমাজের মধ্যে প্রচলিত কাতিপুজার কথা ও গান অংশ রচনায় নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি শ্রী উদ্ধব পাঠক রচিত গোয়ালপাড়ার সংস্কৃতিত কার্ত্তিক পুজা' (দৈনিক অসম, ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৮) থেকে

৬। হাজং সমাজের কাতিপুজা সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি 'হাজং সমাজত দেও আরু অপদেবতা প্রবন্ধ দৈনিক অসম ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ থেকে

৭। LITERATURE IN KĀMATĀ KOCH RĀJDARBĀR
ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্ত্তী এম.এ.পি.এইচ.ডি।

৮। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেদেবী ও পুজাপার্বণ পৃ. ৮৯ ডঃ গিরিজা শংকর রায়।

৯। গোয়ালপাড়ীয়া লোকগীত – হুদুম পুজা পৃঃ ৮৯ ধীরেন দাস।

১০। 'প্রান্তবাসী' (সাপ্তাহিক) সম্পাদক শ্রীশিবেন্দ্র নারায়ণ মন্ডল। বি.এ মহাশয় এই পুজা পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

১১। এই পুজার গান কটির সংগ্রাহক শ্রী বিপুলজিৎ বর্মণ বি.এ। মধুশৌমারী গোয়ালপাড়া।

১২, ১৩। গোয়ালপারীয়া লৌকগীত পৃ. ৯৮ ধীরেন দাস।

১৪। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পালপার্বণ পৃ. ৩০ ডঃ গিরিজাশংকর রায়।

১৫। কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি পৃ. ১৫ সম্পাদনা – অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুধীরঞ্জন দাশ।

১৬। প্রবন্ধে ব্যবহৃত গানগুলির সংগ্রাহক শ্রী শিবেন্দ্র নারায়ণ মন্ডল, গৌরীপুর।

১৭। কোচবিহার রাজবংশের শাখা 'গন্ধর্বনারায়ণের বংশাবলী' গ্রন্থ

১৮। RED RIVER AND GREEN HILLS by HEM BARUA.

১৯। পুরণি কামরূপর ধর্মর ধারা — ২৩ অধ্যায় ডঃ বাণীকান্ত কাকতি।

২০। ঐ ঐ

২১। ঐ ঐ

২২। কোচবিহার শহরের মদনমোহন বাড়ী মন্দিরের দ্বার বক্সী শ্রীযুক্ত অমিয় দেব বক্সী মহাশয় ও তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন পূজা কর্মে নিযুক্ত কর্মচারীদের সহযোগীতায় আমাকে এই বড়দেবী পূজার নানা তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন ।